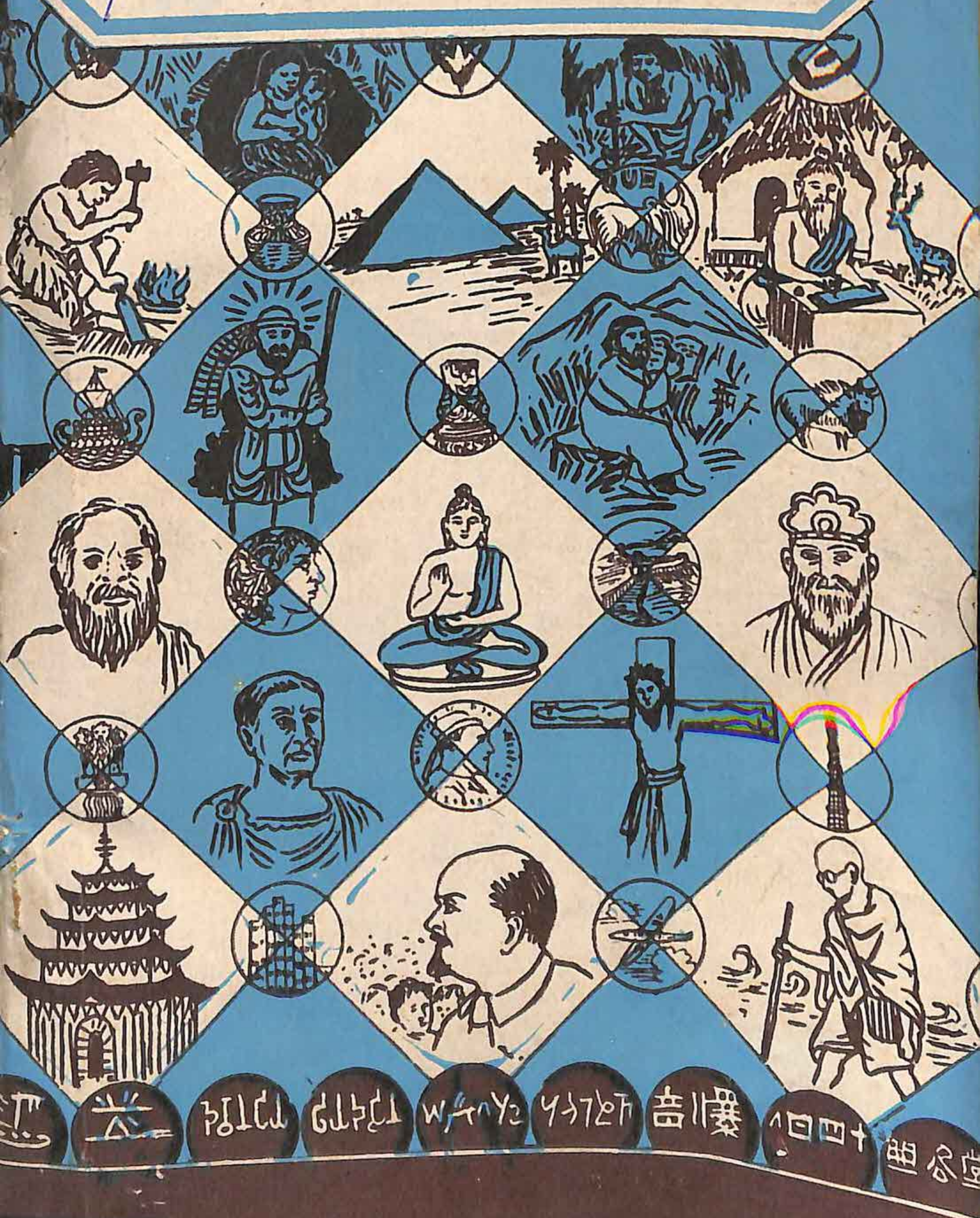
সভ্যতার ইতিহাস



Approved by the West Bengal Board of Secondary Education, for Class VI (Vide T. B. No. VI/H/79/54 dated 5. 12. 79).

সভ্যতার ইতিহাস

(প্রাচীন যুগ)

(ষষ্ঠ শ্রেণী)

শ্রীনির্মলকুমার বসু
গ্রন্থ-রচনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কার-প্রাপ্ত এবং
বিবিধ পাঠ্য পুস্তক-প্রণেতা

ও

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম. এ, বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, এথেনিয়াম ইনস্টিটিউসন, কলিকাতা

BBS

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা-৯
ফোন ৩৪-৫১৭৮ • পিন ৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীচিন্টু বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

তৃতীয় (সংশোধিত ও পরিবর্তিত) সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

মূল্য ঃ নয় টাকা চল্লিশ পয়সা মাত্র।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এই বই-এর ব্লকগুলি প্রীতিভাজন শ্রীআনন্দকুমার পালের সৌজন্য ও অনুমতি-ক্রমে ব্যবহৃত।

প্রথম অধ্যায়

১

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস কি ঃ অতীত ঘটনাবলীর ধারাবাহিক কাহিনীকেই বলা হয় **ইতিহাস**। তা হ'লেও আমরা সাধারণত ইতিহাস বলতে বুঝি, সমাজ-সভ্যতার বিবরণ এবং দেশ ও জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী।

ইতিহাস কেন পড়ি ঃ মনে হ'তে পারে, এইসব বিবরণ ও কাহিনী পড়ে আমাদের লাভ কি? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব, এইসব বিবরণ ও কাহিনী পড়ায় শুধু লাভ হয় না, এগুলি পড়ার প্রয়োজনীয়তাও আছে।

সভ্য ব'লে আমরা গর্ব করি। আমরা আরামে ও নিরাপদে বাস করি, নানারকম সুখাদ্য খাই, সুন্দর সুন্দর পোশাক পরি, আমোদ-প্রমোদ করি, দূর থেকে দূরান্তরে অনায়াসে চলে যাই, এমনকি গ্রহান্তরেও পাড়ি দেওয়ারও চেষ্টা করি।

কিন্তু এমন অবস্থা তো চিরকাল ছিল না। একদিন মানুষ বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় থাকত, অতি কষ্টে খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করত, গাছের বাকল, লতাপাতা, চামড়া দিয়ে গা ঢাকত, পদে পদে বিপদে পড়ত।

সেই ভয়ংকর অবস্থা থেকে মানুষ হাজার হাজার লাখ লাখ বছরের চেষ্টায় আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কিভাবে তারা এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তা জানতে কার না কৌতূহল হয়?

ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি, মানুষের এই আজকার সমাজ-সভ্যতা চিরকাল একরকম ছিল না, চিরকাল একরকম থাকবেও না। আরো বুঝতে পারি, আমরা চেষ্টা করলেই আজকের এই সমাজ-সভ্যতাকে উন্নততর ক'রে তুলতে পারি। ইতিহাস পড়ার লাভ ও প্রয়োজনীয়তা এই।

২

প্রাচীন কালের মানুষ সম্পর্কে জানার উপায়

প্রায় তিন লাখ বছর আগে মানুষ পৃথিবীতে প্রথম জন্মেছিল। সেইসব মানুষ প্রায় পশুর মতোই জীবন-যাপন করত। তাই মনে হ'তে পারে, তাদের সম্বন্ধে কি ক'রেই বা কিছু জানা যেতে পারে?

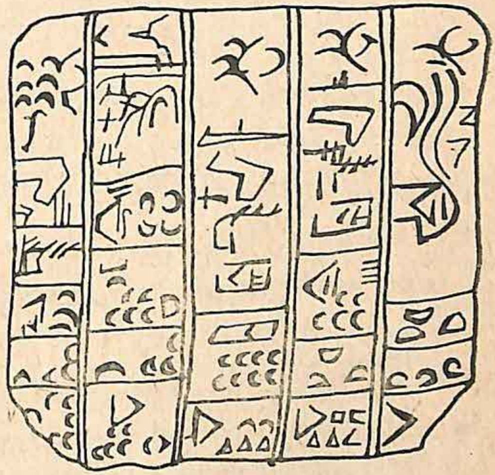
ফসিলঃ কিন্তু তাদের সম্বন্ধেও অনেক কথাই জানা গেছে। প্রাণীরা মারা গেলে সাধারণত ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় তাদের কিছু কিছু চিহ্ন থেকেও যায়। মাটির তলায় মাটির চাপে প্রাণিদেহ পাথরে পরিণত হয়। একে বলে **ফসিল** বা **জীবাশ্ম**। তিন লক্ষ বছর আগেকার মানুষের দেহাবশেষের কিছু কিছু ফসিল পৃথিবীর নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। ঐসব ফসিল জোড়া লাগিয়ে জানা গেছে, ঐ সময় মানুষ দেখতে কেমন ছিল, তারা বুদ্ধিমান ছিল কিনা, তারা ভালো ক'রে কথা বলতে পারত কিনা, ইত্যাদি।

হাতিয়ারঃ ঐ সব ফসিলের সঙ্গে প্রায়ই পাথরের তৈরী হাতিয়ার পাওয়া গেছে। সেগুলি থেকে বোঝা গেছে, তখন মানুষ পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত। এসব দেখে বোঝা গেছে, ঐসব হাতিয়ারে কি কাজ হ'ত—অর্থাৎ ঐসব দিয়ে মানুষ কি কাজ করত।

অনেক পাহাড়ের গুহার মধ্যে মাটির একই স্তরে মানুষের হাড়ের ফসিল, জীবজন্তুর হাড়ের ফসিল ও পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, ঐসব মানুষ পাহাড়ের গুহায় বাস করত, পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত, জীবজন্তু মেরে খেত।

বাসস্থান ও কবরের চিহ্নঃ মানুষ যখন আরো সভ্য হয়েছিল, তখন তারা তাদের বাসস্থান তৈরি করত, কেউ মরলে তাকে কবর দিত। মানুষ বেঁচে থাকার সময়ে যেসব জিনিস ব্যবহার করত, তাও অনেক সময় কবরে দেওয়া হ'ত। মাটির তলা থেকে ঐসব বাসস্থান ও কবরের চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি দেখে বোঝা গেছে, ঐসব মানুষের জীবন-যাত্রা কেমন ছিল, তারা কি কি জিনিস ব্যবহার করত, মৃত্যু সম্বন্ধেই বা তারা কি ভাবত ইত্যাদি।

ভূগর্ভে ধ্বংসাবশেষ : লিপি : মানুষ যখন আরো সভ্য হয়েছিল, তখন তারা নগর, জনপদ, প্রাসাদ, মিনার, মন্দির, মূর্তি গড়েছিল, এমন কি লিপির উদ্ভাবন করেছিল। নানাস্থান খুঁড়ে নগর জনপদের বহু ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে কত ঘর-বাড়ি, মিনার-মন্দিরের চিহ্ন, কতো মূর্তি, মৃৎপাত্র, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অলংকার, সীলমোহর, ভুক্তাবশেষ, এমন কি সুপ্রাচীন লিপিতে লিখিত বিবরণ, অনুশাসন পর্যন্ত। সুপ্রাচীন



প্রাচীন লিপি

লিপিগুলি এখনকার লিপির মতো না হ'লেও পণ্ডিতরা প্রাণপাত ক'রে ঐগুলির পাঠোদ্ধার করেছেন। পাঠোদ্ধারের ফলে মিশর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানের ছ-সাত হাজার বছর আগেকার মানুষ সম্পর্কেও অনেক কথা জানা গেছে।

সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি : মানুষ যখন আরো সভ্য হয়েছে, তখন তারা রচনা করেছে সাহিত্য। ধর্মগ্রন্থ, এমন কি ইতিহাস পর্যন্ত। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে আমরা সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার ভারতবাসী সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। গ্রীসের মহাকাব্য **ইলিয়াড** ও **ওডিসি** থেকে জানতে পেরেছি এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার গ্রীসের কথা। **হেরোডটাস** রচিত পৃথিবীর প্রাচীনতম ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীস, পারস্য, মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারত প্রভৃতি নানা স্থানের প্রাচীন মানুষদের কথা।

প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাস কাকে বলে?

২। ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

৩। জীবাশ্ম কি? আদিম যুগের মানুষ সম্বন্ধে জানতে সেগুলি আমাদের কি সাহায্য করেছে?

৪। আবিষ্কৃত প্রাচীন মানুষদের কবর কি ভাবে তাদের কথা জানতে সাহায্য করেছে?

৫। প্রাচীন কালের লিপিগুলি প্রাচীন মানুষদের সম্বন্ধে জানতে আমাদের কি সাহায্য করেছে?

৬। প্রাচীন কালের মানুষ সম্বন্ধে আমরা প্রধানত কিভাবে জানতে পারি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ—প্রস্তর যুগ

১

আদিম মানুষ

মানুষের উদ্ভব : বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রাণিজগতে ক্রমবিকাশের ফলে এখন থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণী এবং সবশেষে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল।



আদিম মানুষ

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানের ভূগর্ভে গভীর মৃত্তিকা-স্তরে আদিম মানুষের বহু মাথার খুলি ও হাড়ের ফসিল পাওয়া গেছে। সেই সব ফসিল জোড়া লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ঐসব আদিম মানুষ গরিলা ও শিম্পাঞ্জি এবং আমাদের মতো মানুষের মাঝামাঝি কয়েকটা স্তরে

ছিল। যে-সব জায়গায় ঐসব ফসিল পাওয়া গেছে, সেগুলির নাম অনুসারে আদিম কালের মানুষদের তাঁরা নানা নাম দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যেরও উল্লেখ করেছেন। যাই হ'ক, এসব আদিম মানুষ যে ঠিক আমাদের মতো মানুষ ছিল না, সে বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত।

এখনকার মানুষের সঙ্গে এদের পার্থক্যঃ এইসব আদিম মানুষের কপাল ছিল ঢালু, চোয়াল বেশ বড়, মস্তিষ্কের গহ্বর খুব ছোট, ঘাড় প্রায় ছিলই না। আর হাঁটুর কাছের হাড় ছিল বাঁকা।

এদের মস্তিষ্কের গহ্বর ছোট হওয়ায় বোঝা যায়, আমাদের চেয়ে এদের মস্তিষ্ক ছোট ছিল। তাই এরা আমাদের মতো বুদ্ধিমান ও কল্পনা-শক্তির অধিকারী ছিল না। এদের চোয়াল খুব বড় হওয়ায় এরা সম্ভবত আমাদের মত সাবলীলভাবে কথা বলতে পারত না। হাঁটুর কাছে পায়ের হাড় বাঁকা থাকায়, এরা খুব সম্ভব পা টেনে টেনে হাঁটত।



আদিম মানুষের আগুনের ব্যবহার

আগুনের ব্যবহারঃ তবে এরা যে একেবারে বুদ্ধিমান ছিল না, তা নয়। মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—আগুনের ব্যবহার—সম্ভবত এরাই প্রথম করেছিল।

চীনদেশে পিকিংয়ের কাছে পাহাড়ের গুহায় তিন লাখ বছর আগেকার আদিম মানুষের ফসিলের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের হাড়ের কিছু ফসিল পাওয়া গেছে। জন্তু-জানোয়ারের হাড়গুলিতে রয়েছে আগুনে পোড়ানো বা ঝলসানোর চিহ্ন। তা থেকে বোঝা গেছে, তিন লাখ বছরের এইসব আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত। বজ্রপাত, বনে কাঠে কাঠে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন দাবাগ্নি বা পাথরে পাথর ঠোকার ফলে উৎপন্ন অগ্নিকণা থেকেই এরা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল।

এইসব আদিম মানুষ আড়াই লাখ বছরেরও বেশি কাল পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল। এইসব আদিম মানুষ থেকে ক্রমবিকাশের ফলেই আমাদের মতো মানুষের উদ্ভব হয়েছিল।

২

পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি—সেগুলির ব্যবহার

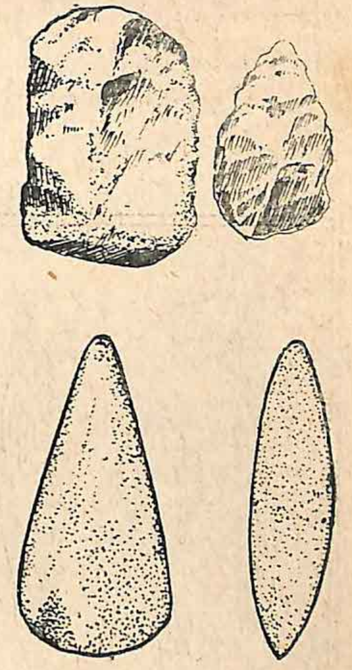
প্রস্তর যুগ ঃ মাটির তলায় আদিম মানুষের এবং গোড়ার যুগের আধুনিক মানুষের হাড়, মাথার খুলি ইত্যাদির ফসিলের সঙ্গে বহু পাথরের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। ঐ সময় মানুষ কাঠ বা হাড়ের তৈরী যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত, সেগুলির কোনও চিহ্ন আর নেই। ধাতুর তৈরী কোন জিনিসও পাওয়া যায়নি। তাই বিজ্ঞানীরা ঐ সময়ের নাম দিয়েছেন **প্রস্তর যুগ**।

প্রস্তর যুগকে তাঁরা আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন—**পুরা-প্রস্তর যুগ** ও **নব-প্রস্তর যুগ**।

পুরা-প্রস্তর যুগ

যে সময়কার পাথরের হাতিয়ারগুলি বড়, এবড়ো-খেবড়ো, ভোঁতা ও ছিদ্রহীন ছিল, সেই সময়ের নাম দেওয়া হয়েছে **পুরা-প্রস্তর যুগ**। পুরা-প্রস্তর যুগ পৌনে তিন লাখ বছরেরও

বেশি স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালেও এই সব হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয়নি। পাথরের এইসব হাতিয়ার ও অস্ত্র দেখে বোঝা যায়, এগুলি খন্তা, জোরে ঘা দিয়ে কাটার অস্ত্র এবং চামড়া প্রভৃতি আঁচড়ে চেঁছে পরিষ্কার করার যন্ত্র ছিল। এগুলি দিয়ে তারা মাটি খুঁড়ত, জোরে ঘা দিয়ে মাংস ইত্যাদি কাটত এবং আঁচড়ে চেঁছে-ছুলে চামড়া পরিষ্কার করত।



পুরা প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার

পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা ঃ পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক। অর্থাৎ তারা বনে-জঙ্গলে. জলাভূমিতে ঘুরে ফলমূল, শস্যাদি সংগ্রহ করত, শিকার করত, মাছ মারত। তারা চাষ-আবাদ ও পশুপালন জানত না। তারা খাদ্য উৎপাদন করত না, সংগ্রহ করত।

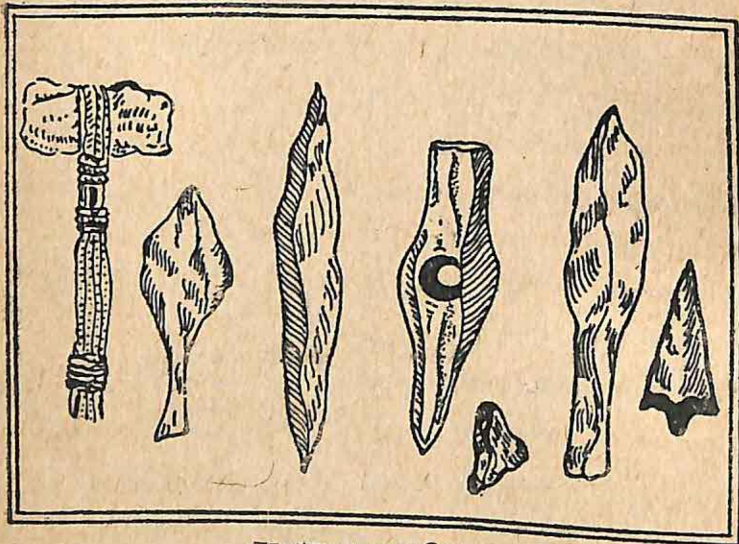
৩

নব-প্রস্তর যুগ

আধুনিক বা প্রকৃত মানুষ ঃ পুরা-প্রস্তর যুগের শেষের দিকে আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। তাদের কপাল ছিল আমাদের মতো খাড়া, মস্তিষ্ক বড়, চোয়ালের হাড় ছোট, চিবুক বেশ স্পষ্ট, পায়ের হাড় সোজা। তারা আদিম মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল, ভালভাবে কথা বলতে পারত, সহজভাবে হাঁটত। এরা খুব বুদ্ধিমান হওয়ায় দ্রুত পাথরের হাতিয়ারগুলির উন্নতি হ'তে লাগল।

নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ঃ পাথরের হাতিয়ারগুলি এখন আকারে ছোট, মসৃণ ও ধারালো হ'ল, সেগুলিতে ছিদ্র করা গেল।

পাথরের হাতিয়ার ছিদ্র করতে পারায়, তাতে কাঠের বা হাড়ের হাতল লাগানো সম্ভব হ'ল। আগে যা থন্তা ছিল, এখন তা কুড়াল হয়ে উঠল। মানুষ এখন প্রয়োজনমতো নানা ধরনের হাতিয়ার তৈরি করল। সেগুলিতে হাতল লাগিয়ে ব্যবহারের উপযুক্ত করল।



নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

এইসব উন্নত ধরনের পাথরের হাতিয়ার যে সময়ে ব্যবহৃত হচ্ছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছে নব-প্রস্তর যুগ। এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে নব-প্রস্তর যুগ শুরু হয়েছিল।

৪
এখন মানুষ হ'ল খাদ্য-উৎপাদক

নব-প্রস্তর যুগের মানুষ কেবল পাথরের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতিই করল না, তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতেও যুগান্তর ঘটল।

পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক, এখন মানুষ হ'ল খাদ্য-উৎপাদক।

কৃষি : পুরুষরা শিকারে যেত, আর মেয়েরা বনে-বাদাড়ে ফলমূল, শস্য, লতাপাতা সংগ্রহ ক'রে বেড়াত। মেয়েরা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিল, কিভাবে বীজ, কন্দ ও শাখা থেকে গাছ জন্মায়। এখন তারা কাজের ফাঁকে তাদের বাসস্থানের পাশে বীজ বুনতে, কন্দ পুঁততে ও গাছ লাগাতে শুরু করল। এমনিভাবে শুরু হ'ল কৃষি। চাষ ক্রমেই বাড়তে লাগল। এখন মেয়েরা বনে-বাদাড়ে খাদ্যের খোঁজ করা ছেড়ে চাষ করতে লাগল। বনের ফলমূল, শস্য ও লতাপাতা ছিল অনিশ্চিত। এখন সেগুলি নিশ্চিত হয়ে উঠল।

গোড়ার যুগে কৃষিকার্য খন্তা ও নিড়ানির সাহায্যে করা হ'ত। পরে লাঙলের ব্যবহার শুরু হ'ল। লাঙল চালানো ছিল শ্রমসাধ্য। তাই ক্রমে চাষ-আবাদে পুরুষেরই প্রাধান্য হ'ল।

পশুপালন : পুরুষরা বনে সারাদিন শিকার ক'রে বেড়াত। শিকার ছিল অনিশ্চিত। তাই মানুষ হিংস্র নয়, এমন কিছু জন্তু-জানোয়ারকে পোষ মানাল। এইভাবে তারা ছাগল-ভেড়া, গোরু-মহিষ, শূয়োর প্রভৃতি পশু পুষল। শুরু হ'ল **পশুপালন**। চাষ-আবাদ করায় পশুর খাদ্য জোগানো তখন সহজ ছিল। জলাভূমিতে ও তৃণাঞ্চলে পশুর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ থাকায়, ঐসব স্থানে পশুপালন প্রধান বৃত্তি হয়ে উঠল। পশুপালনের ফলে মাংস সহজ-লভ্য হ'ল। মানুষ দুধের ব্যবহারও শিখল।

খাদ্যের অনিশ্চয়তার হাত থেকে মানুষ রক্ষা পেল।

৫

বিভিন্ন শিল্প, বাসগৃহ ও পরিবহন

নব-প্রস্তর যুগের শিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল **মৃৎশিল্প** ও **বয়নশিল্প**।

মৃৎশিল্প : সারা বছরের জন্য ফসল সঞ্চয় ক'রে রাখতে হ'ত। তাই পাত্রের প্রয়োজন ছিল। এজন্য তারা ঝুড়ি বা চুপড়ি ব্যবহার করত। ঝুড়ি ও চুপড়িগুলিকে ছিদ্রহীন করার জন্য তাতে মাটির প্রলেপ দিত। এই প্রলেপ-দেওয়া ঝুড়ি ও চুপড়ি স্থায়ী করার জন্য পোড়াতে গিয়েই মানুষ প্রথম **মৃৎশিল্প** আবিষ্কার করে। গোড়ার

দিকে ঝুড়ি-চুপড়িতে মাটির প্রলেপ দিয়ে, তা পুড়িয়ে মৃৎপাত্র তৈরি করা হ'লেও, পরে কেবল মাটি দিয়েই তারা মৃৎপাত্র তৈরি করতে লাগল। গোড়ার দিকে তারা হাত দিয়েই পাত্রগুলি গড়ত এবং একাজ অবসর সময়ে মেয়েরাই করত। কিন্তু ক্রমেই মানুষের



নব-প্রস্তর যুগের তৈজস পত্র

অভিজ্ঞতা বাড়ল। তারা মৃৎপাত্র তৈরির কাজে চাকের ব্যবহার শুরু করল। এখন পাত্রগুলির গঠন কেবল সুন্দর ও সুষম হয়ে উঠল না, পাত্র তৈরির কাজ দ্রুত হয়ে উঠল। মৃৎশিল্পে চাকের ব্যবহার চালু হওয়ার পর, এতেও ক্রমেই পুরুষের প্রাধান্য ঘটল।

বয়নশিল্প ঃ পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ গাছের লতাপাতা, বাকল ও পশুর চামড়া দিয়ে শীত ও লজ্জা নিবারণ করত। এখন চাষ ও পশুপালন শুরু হওয়ায় তিসি ও শণজাতীয় গাছের তন্তু এবং পশুর লোম দিয়ে সুতো তৈরি ক'রে তারা কাপড় বুনতে লাগল। ঐ যুগে সুতো-কাটা ও কাপড-বোনা কিভাবে হ'ত, তা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবত, ঐসব যন্ত্রপাতি কাঠ দিয়ে তৈরি হ'ত, তাই সেগুলি কালক্রমে লোপ পেয়েছে। অনেকের মতে, মেয়েরাই বয়নশিল্পও আবিষ্কার করেছিল।

বাসগৃহ নির্মাণ ঃ পুরা-প্রস্তর যুগে মানুষ প্রধানতঃ পাহাড়ের গুহাতেই বাস করত। কিন্তু পাহাড়ের মাটি উর্বর না হওয়ায়, নব-

প্রস্তর যুগের কৃষিজীবী মানুষকে পাহাড় থেকে দূরে উর্বর জমিতে চাষ-আবাদ করতে হ'ত। চাষ দেখাশোনার জন্য চাষীকে চাষের জমির কাছে থাকতে হ'ত। তাই মানুষ বাসগৃহ বানাতে শুরু করল। তারা নলখাগড়া-জাতীয় গাছ ও গাছের ডালপালা এবং মাটি দিয়েই গোড়ার দিকে ঘর বানাতো। যেখানে পাথর পাওয়া সহজ, সেখানে পাথর দিয়েও ঘর বানাত। জন্তুজানোয়ার ও শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা ঘরগুলির চারদিকে কাঠ, পাথর ও খুঁটি দিয়ে বেড়া দিত। অনেকে হ্রদ বা বড় জলাশয়ের মধ্যে বড় বড় কাঠ পুঁতে বাড়ি বানাত। যাযাবর পশুপালকরা কিন্তু স্থায়ী ঘর তৈরি না ক'রে চামড়ার ছাউনি ক'রে তাতে থাকত।

পরিবহণ : নব-প্রস্তর যুগে যাতায়াত এবং মাল আনা ও পাঠানোর ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি হয়েছিল। মানুষ এখন গৃহপালিত পশুকে মাল বইবার কাজে লাগালো। গৃহপালিত পশুর পিঠে চড়েও তারা এখানে-ওখানে যেত। তারা গাড়িও বানালো। তবে গোড়ার দিকের গাড়িগুলি ছিল চাকাবিহীন স্লেজের মতো। মাটির উপর দিয়েই গাড়িগুলি টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত। মানুষ শীঘ্র চাকার আবিষ্কার করল এবং গাধা, গোরু ও মহিষে টানা গাড়ির মতো গাড়িগুলি চালু হ'ল।

জলপথেও এযুগে মানুষ যাতায়াত শুরু করেছিল। গোড়ার দিকে নলখাগড়া-জাতীয় গাছের আঁটি বেঁধে বা কাঠের পাশে কাঠ বেঁধে তারা ভেলা তৈরি করত। পরে তারা নৌকাও তৈরি করতে লাগল।

৬

স্থায়ী সমাজের সূচনা—ভাষার উদ্ভব

স্থায়ী বসবাস ও যৌথ জীবনযাত্রা : নব-প্রস্তর যুগে কৃষিকার্য শুরু হওয়ায় মানুষ যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল। এইভাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় তাদের সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল। তারা সমাজে একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করত। তারা পরস্পরকে সাহায্য করত; তাদের উৎপাদিত সম্পদ্ তারা

সকলে প্রয়োজনমতো ভাগ ক'রে নিত। তাদের সমাজে এখনও উৎপন্ন দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত না হওয়ায় ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ ছিল না। কতকটা সাম্যের ভিত্তিতেই সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

ভাষার উদ্ভব ঃ একই স্থানে দীর্ঘকাল দলবদ্ধভাবে বাস করায় এবং সকলে সম্মিলিতভাবে শ্রম করায় নিজেদের মধ্যে তাদের মনের ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মনের ভাব সুস্পষ্ট-ভাবে জানাবার জন্য তারা সকল কিছুর একটা সুনির্দিষ্ট নাম দিয়েছিল। ঐসব সুনির্দিষ্ট নাম থেকে গ'ড়ে উঠেছিল সুনির্দিষ্ট শব্দ। একই শব্দ দীর্ঘকাল ব্যবহার করায়, সেগুলি স্থায়ী রূপ পেয়েছিল। এইভাবে ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল।

৭

চিন্তাভাবনা—শিল্পকলা—উৎপাদিকা—শক্তির উপাসনা

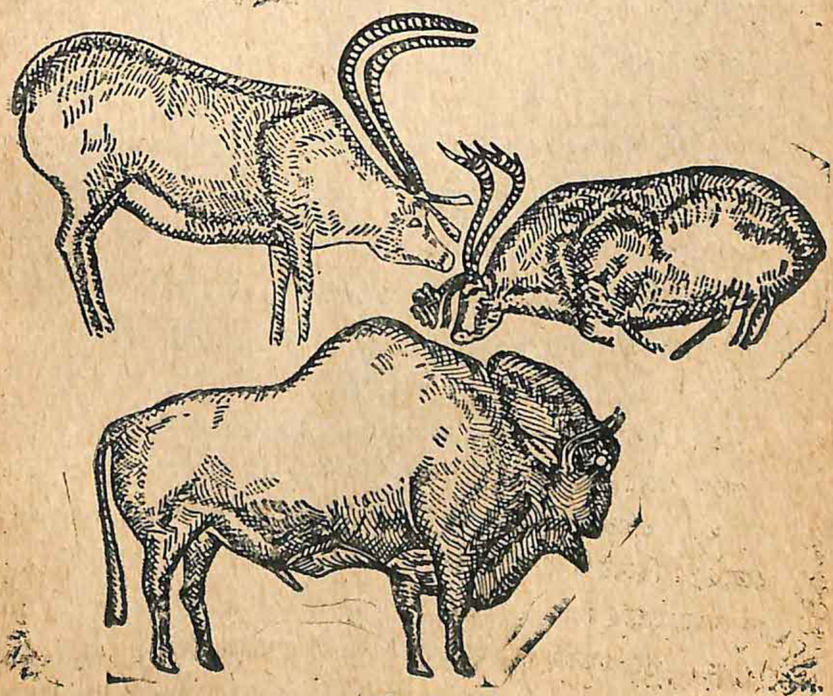
চিন্তাভাবনা ঃ সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ, মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়, সে সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেছিল। মৃত্যুতেই জীবনের শেষ হয় না, এরকম একটা ধারণা তাদের মনে ছিল। তাই তারা মৃতদেহগুলি কবর দেওয়ার সময়ে জীবিত অবস্থায় তাদের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য সকল জিনিসই কবরে দিত।

জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস ঃ প্রকৃতির কোলেই তাদের জীবন কাটত। অথচ প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে তাদের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই প্রাকৃতিক শক্তিকে তারা ভয় করত এবং সেগুলি তারা নানা অপদেবতার কাজ মনে করত। এগুলির প্রতিবিধায়করূপে তারা নানাপ্রকার তুকতাক ও জাদুবিদ্যা বিশ্বাস করত। এই জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস থেকেই তাদের শিল্পকলার চর্চা শুরু হয়েছিল।

স্পেনের গিরিগুহায় তাদের আঁকা বহু চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐসব চিত্র যে শিল্পকলার চর্চা বা মনোরঞ্জনের জন্য অঙ্কিত হয় নি, তা এই থেকে বোঝা যায় যে, সেগুলি সাধারণত লোকালয় থেকে দূরে নির্জন ও দুর্গম গিরিগুহায় অঙ্কিত হ'ত। তাদের ধারণা ছিল চিত্রে যা আঁকা যায়, কার্যতও তা ঘটে। স্পেনের গিরিগুহায় একটি



হরিণ- শিকারের গুহাচিত্র



স্পেনের আল্‌টামিরার গুহাচিত্র

হরিণ-শিকারের চিত্র আছে। চিত্রে দেখানো হয়েছে, একদল শিকারী হরিণকে তীরবিদ্ধ করছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, ঐ ছবির জাদু-শক্তিতেই শিকারীরা কার্যত হরিণকে ঐভাবে তীরবিদ্ধ করতে পারবে। জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী হওয়ায় তারা মাদুলি, কবচ, আংটি প্রভৃতি ধারণ করত।

শিল্পকলা ঃ জাদুবিদ্যার প্রয়োগরূপে এইসব চিত্র অঙ্কিত হলেও, এইসব চিত্র রেখায় ও রঙে এত জীবন্ত যে, তা যে কোন চিত্রকরের ঈর্ষার বস্তু। ঐ যুগে তারা মূর্তিও নির্মাণ করত। মূর্তিগুলি সাধারণত স্ত্রীলোকের—সেগুলিতে স্ত্রীলোকের উৎপাদিকা-শক্তির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদিকা-শক্তির উপাসনা ঃ এই যুগের লোকেরা স্ত্রীলোকের উৎপাদিকা-শক্তিকে স্বীকার করত। স্ত্রীলোক কেবল সন্তানের জন্ম দেয় না, স্ত্রীলোকরাই কৃষি, মৃৎশিল্প, বয়ন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ আবিষ্কার করেছিল। তাই উৎপাদিকা-শক্তি তাদের কাছে দেবী। তারা কোন স্ত্রীলোককে উৎপাদিকা-দেবীর প্রতীকরূপে কল্পনা করত। তারপর সকলের মঙ্গলের জন্য তাকে হত্যা ক'রে তার রক্ত কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিত। তাদের ধারণা ছিল, ঐভাবেই ভূমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পাবে। কোন জমিকে দু-তিন বছর চাষ করার পরে জমির উর্বরা-শক্তি হ্রাস পেত, সেজন্য উৎপাদিকা-শক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করা তাদের একটি প্রধান সমস্যা ছিল। তাই উৎপাদিকা-শক্তির দেবীর কল্পনা ও আরাধনা তাদের ধর্ম হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্নাবলী

১। এখন থেকে কত বছর আগে আদিম মানুষের উদ্ভব হয়েছিল মনে হয়? কি থেকে তাদের উদ্ভব ঘটেছিল? আধুনিক মানুষের সঙ্গে তাদের কি পার্থক্য ছিল?

২। প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ? প্রস্তর-যুগকে ক'ভাগে ভাগ করা হয়েছে? কিসের ভিত্তিতে ঐরূপ ভাগ করা হয়েছে? ঐ ভাগগুলির নাম কি দেওয়া হয়েছে?

৩। পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি কেমন ছিল? সেগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হ'ত? পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান?

৪। নব-প্রস্তর যুগে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির কি উন্নতি হয়েছিল? নব-প্রস্তর যুগের মানুষ খাদ্য-উৎপাদক ছিল—এ কথার অর্থ কি?

৫। নব-প্রস্তর যুগের মানুষ বিভিন্ন শিল্পে কিরূপ উন্নতি করেছিল?

৬। নব-প্রস্তর যুগে পরিবহণ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৭। নব-প্রস্তর যুগে মানুষের ধ্যান-ধারণা কিরূপ ছিল?

৮। প্রস্তর যুগের মানুষের চিত্রকলা সম্পর্কে কি জান? ঐগুলি কি উদ্দেশ্যে অঙ্কিত হ'ত ব'লে তোমার মনে হয়?

৯। ভুল অংশগুলি কেটে দাও:

(ক) পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য-উৎপাদক/খাদ্য-সংগ্রাহক।

(খ) আদিম মানুষরা আগুনের ব্যবহার জানত/জানত না।

(গ) নব-প্রস্তর যুগের লোক মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্প জানত/জানত না।

(ঘ) কৃষির উদ্ভাবন করেছিল মেয়েরা/পুরুষেরা।

(ঙ) প্রস্তর যুগের মানুষ চিত্রাঙ্কন জানত/জানত না।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) আদিম মানুষের কপাল ছিল —, চোয়াল ছিল বেশ —, মস্তিষ্ক ছিল —, পায়ের হাড় ছিল —।

(খ) পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য—। তারা —, কন্দ, — লতাপাতা প্রভৃতি — করত। তারা — ও পশুপালন জানত না। তারা বনে বনে — শিকার করত, জলাশয়ে ও হ্রদে — ধরত।

(গ) নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ছিল —, —,— ও সছিদ্র। পাথরের হাতিয়ারে ছিদ্র করতে পারায় তারা তাতে — ও — হাতল লাগাল; যা ছিল খন্তা ও নিড়ানি, তা এখন হয়ে উঠল —। নব-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য —।

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

তাম্র ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার: মানুষ এতদিন পাথর দিয়ে তৈরি হাতিয়ারই ব্যবহার করত। কিন্তু একসময় তারা তামা আবিষ্কার করল। তারা দেখল, একপ্রকার পাথর তাপে গ'লে যায় এবং পরে ঠাণ্ডা হ'লে বেশ শক্ত হয়। গলিত অবস্থায় তাকে ইচ্ছামতো আকার দেওয়া যায়। তারপর ঠাণ্ডা হ'লে ঐগুলি বিভিন্ন আকারের মজবুত হাতিয়ার, যন্ত্র, অস্ত্র ও পাত্রে পরিণত হয়।

এখন লোক পাথরের হাতিয়ার ইত্যাদির ব্যবহার ছেড়ে তামার ব্যবহার শুরু করল।

ঐ সময়ে তারা টিন বা রাং-ও আবিষ্কার করল। তামার সঙ্গে রাং মেশালে তা আরো শক্ত ও মজবুত হয়। এই মিশ্র ধাতুর নাম ব্রোঞ্জ। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ল। এইভাবে শুরু হল তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ এখন থেকে প্রায় ছ' হাজার বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

১
উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন—ব্যবসা-বাণিজ্য—নগরের উদ্ভব

উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন: ক্রমেই কৃষিকার্যে উন্নতি হ'ল এবং তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কৃষির উৎপাদনে খাদ্য উদ্‌বৃত্ত দেখা গেল। কৃষিজাত খাদ্য উদ্‌বৃত্ত হওয়ায় এখন সকলের কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকার প্রয়োজন হ'ল না। কিছু লোক কৃষিকার্য না ক'রে অন্য কাজে পুরোপুরি সময় দিতে পারল। আগে সকলেই কৃষিকার্য করত এবং কৃষিকার্যের ফাঁকে অন্যান্য কাজও করত। কৃষিকার্যে যতোই উন্নতি হ'ল, কৃষিজাত দ্রব্যে যতোই বেশি উদ্‌বৃত্ত হ'ল, ততোই অধিক সংখ্যায় লোক কৃষিকার্য ছেড়ে অন্যান্য কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করল।

এইভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল। সমাজে নানা বৃত্তি বা পেশার লোক দেখা গেল। বিভিন্ন বৃত্তিতে লোকে এখন পুরো সময় দেওয়ায় ঐসব বৃত্তিতেও তারা সুদক্ষ হয়ে উঠল।

ব্যবসা-বাণিজ্য: বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করতে লাগল। পরস্পরের প্রয়োজন মেটানো হ'তে লাগল বিনিময়ের মাধ্যমে। চাষী কুমোরকে শস্য ও সব্‌জি দিল, কুমোর চাষীকে দিল হাঁড়ি-কলসি।

কিন্তু চাষীকে যদি বিনিময়ের মাধ্যমে তার বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহের জন্য কুমোর, তাঁতী, ছুতোর মিস্ত্রী ও কারিগরেরা কাছে

ছুটতে হয়, তবে হয়রানি ও সময়ের অপব্যয়ের সীমা থাকে না। তাই এক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ ক'রে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষকে তাদের প্রয়োজনমতো তা সরবরাহ করতে লাগল। এইভাবে সমাজে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হল—**ব্যবসায়ী-শ্রেণীর।**

এরা কেবল বিনিময়ের মাধ্যমে স্থানীয় বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের প্রয়োজন মেটালো না, যেসব জিনিস স্থানীয় অঞ্চলে পাওয়া যায় না, তা-ও বিনিময়ের মাধ্যমে সংগ্রহ ক'রে আনল দূর দূর স্থান থেকে। কৃষির উপযোগী উর্বর অঞ্চলে পাথর ও ধাতুর খুবই অভাব। আবার যেখানে পাথর ও ধাতু পাওয়া যায়, সেখানে কৃষিজাত দ্রব্যের খুবই অভাব। বণিক শ্রেণীর লোকেরা কৃষিজীবী সমাজের লোকদের কাছ থেকে কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে গিয়ে বিনিময়ের মাধ্যমে পাথর ও ধাতুর অঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে পাথর ও ধাতু সংগ্রহ ক'রে আনল। কেবল কৃষিজাত দ্রব্য নয়, উদ্‌বৃত্ত শিল্প-জাত দ্রব্যের বিনিময়েও এইরূপ আদান-প্রদান চলতে লাগল। এইভাবে গড়ে উঠল **ব্যবসা-বাণিজ্য।**

শহরের উৎপত্তি : কিন্তু কার কি উদ্‌বৃত্ত আছে এবং কার কি প্রয়োজন, তা খোঁজ নিয়ে ঘুরে ঘুরে মাল সংগ্রহ করা ও যোগান দেওয়া সহজ নয়। তাই ব্যবসায়ীরা একটি নিদিষ্ট স্থানে আস্তানা গাড়ল। যার যা উদ্‌বৃত্ত আছে, তারা যেমন সেখানে আনল, তেমনি যার যা প্রয়োজন আছে, তা সংগ্রহের জন্যও মানুষ সেখানে এল। এইভাবে ঐসব নির্দিষ্ট আস্তানায় জনসমাবেশ ঘটতে লাগল। কৃষি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তির লোকেরাও ঐসব আস্তানার কাছে-পিঠেই তাদের উৎপাদনের স্থানগুলি গড়ে তুলল। কারণ, তাদের শিল্পজাত দ্রব্য তাতে ব্যবসায়ীকে যোগান দেওয়া সহজ হ'ল। এইভাবে গড়ে উঠল গঞ্জ ও গঞ্জ থেকে **শহর।**

শহরগুলিই এখন সকলের মিলন-স্থল হ'ল, হয়ে উঠল সমাজ-জীবনের কেন্দ্রস্থল।

২

সমাজ-জীবনে পরিবর্তন—বিভিন্ন শ্রেণী—উপজাতিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ—রাষ্ট্রের সূচনা

আগে যখন উৎপাদনে উদ্‌বৃত্ত হ'ত না, তখন সকলেই যৌথভাবে উৎপাদন করত এবং উৎপন্ন দ্রব্য ভাগ ক'রে নিত। এখন উৎপাদনে উদ্‌বৃত্ত বেশী হ'তে থাকায় যারাই উদ্‌বৃত্তের বেশী অধিকারী হ'ল, তারাই ক্রমে ধনী হয়ে উঠল। যারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত রইল, তাদের হাতেও ধন সঞ্চিত হ'তে লাগল। এইভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা দিল। যার হাতে যতো ধন সঞ্চিত হ'ল, সমাজে সে হ'ল ততোই ক্ষমতাশালী। তারা নানা কৌশলে সমাজের দুর্বল মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনা ক'রে আরো ক্ষমতাশালী হ'য়ে ধনী অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হ'ল।

কৃষিজীবী সমাজের মানুষকে প্রকৃতির প্রসন্নতার উপর নির্ভর করতে হ'ত। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়—সকলই ছিল কৃষিজীবী সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণগুলি জানত না। তাই তারা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতার প্রসন্নতা বা রোষ ব'লেই ভাবত এবং নানা দেবদেবীর কল্পনা করত। দেবতার প্রসন্নতাই কৃষিজীবী সমাজের উন্নতির কারণ ব'লে ভাবায় কৃষিজীবী সমাজের মানুষরা তাদের ভূমি ও ধনসম্পদকে দেবতার করুণার দান মনে করত। তাই তারা প্রত্যেক নগরে অধিষ্ঠাতা দেবতার মন্দির স্থাপন করল এবং দেবতাকে প্রসন্ন রাখার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ দেবতার মন্দিরে দিল। দেবতার সেবায় একশ্রেণীর মানুষ সর্বদা ব্যস্ত রইল। এরা **পুরোহিত** শ্রেণী ব'লে পরিচিত ছিল। দেব-মন্দিরের সকল ধনসম্পদ এদের অধিকারে থাকায় এরাও ধনী ও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। অনেক সময় এরা এতই ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠত যে, নগরের প্রধান পুরোহিতই হয়ে উঠত রাজা।

উপজাতিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ : বিভিন্ন উপজাতির মানুষ কোন উর্বর অঞ্চলে অনেক সময় পাশাপাশি বাস করত। এইসব

উপজাতির মধ্যে প্রায়ই রেষারেষি, বিবাদ ও সংঘর্ষ বাধত। অনেক সময় কৃষিজীবী সমাজের পাশে যেসব পশুপালক উপজাতি বাস করত, তারাও কৃষিজীবী সমাজের ধন-সম্পদে লুব্ধ হয়ে কৃষিজীবী উপজাতিগুলির উপর হানা দিত।

এইসব সংঘর্ষে এক শ্রেণীর লোক নিজ নিজ উপজাতির মানুষ ও তাদের ধনসম্পদ রক্ষার জন্য অগ্রণী হ'ত এবং অসামান্য বীরত্ব ও বুদ্ধির জন্য প্রভাবশালী হয়ে উঠত। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হ'ত, তারা সহজেই সর্দার হ'ত এবং সর্দাররা শক্তিশালী হয়ে উঠলে রাজা হ'ত।

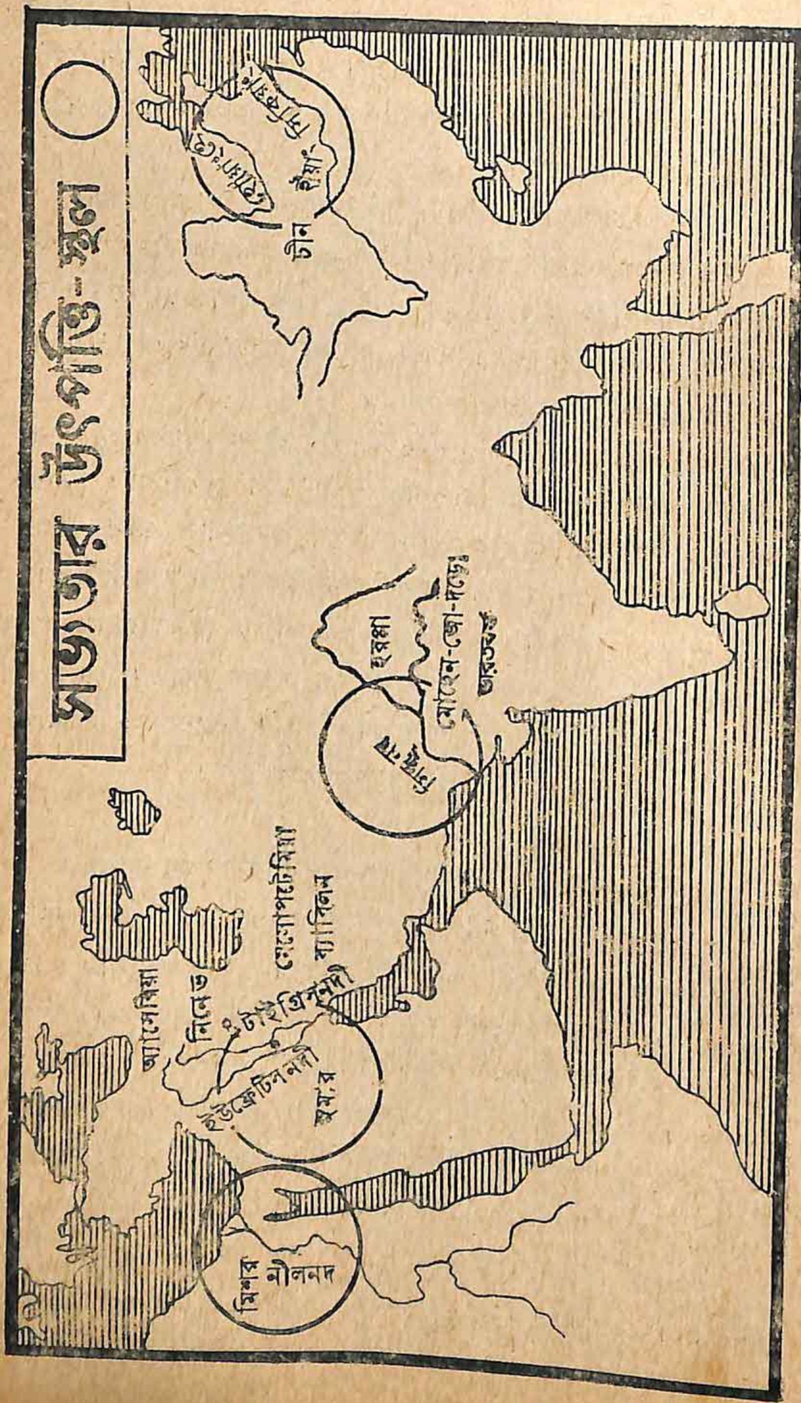
রাষ্ট্রের সূচনা ঃ এক শ্রেণীর লোক যথেষ্ট ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ায় সমাজে তাদের প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা বাইরের হানাদারদের হাত থেকে যেমন ধনসম্পত্তি রক্ষা করত, তেমনি সমাজের ভেতরেও সঞ্চিত ধনসম্পত্তি রক্ষার কাজে অগ্রণী ছিল। এরা বুদ্ধিমান, সাহসী এবং প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ায়, সাধারণ মানুষ এদের উপদেশ ও আদেশ পালন করত। এভাবে ধীরে ধীরে এরা শাসক শ্রেণীতে পরিণত হ'ল। এদের পরিচালনায় দেশে শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠল ও রাষ্ট্রের সূচনা হ'ল।

৩

নদীতীরবর্তী অঞ্চলে মানব-সভ্যতার বিকাশের কারণ

কৃষিজীবী সমাজের মানুষের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল ভূমির উর্বরা-শক্তি রক্ষা করা। কৃষিজীবী মানুষরা বনজঙ্গল সাফ ক'রে মনোমত কৃষিক্ষেত্র রচনা করত। ঐসব কৃষিক্ষেত্রে কয়েক বছর ভালো চাষ হ'ত। তারপর জমির উর্বরা-শক্তি হ্রাস পাওয়ায়, ভালো চাষ হ'ত না। তখন কৃষিজীবী মানুষদের ঐসব কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে আবার নূতন ক'রে কৃষিক্ষেত্রের সন্ধান করতে হ'ত। নূতন কৃষিক্ষেত্রের সন্ধানে তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হ'ত।

কিন্তু নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ভূমির উর্বরা-শক্তি নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল না। বন্যার জলে কৃষিক্ষেত্রগুলি প্রায়ই ডুবে যেত এবং জমিতে


সভ্যতার উৎপত্তি-স্থল
চীন
হরপ্পা
মোহেন-জো-দড়ো
ভারতবর্ষ
মেসোপটেমিয়া
ব্যাবিলন
আসেরিয়া
নিনেভ
টাইগ্রিস নদী
ইউফ্রেটিস নদী
সুমের
মিশর
নীলনদ

পলি প'ড়ে কৃষিক্ষেত্রগুলি পুনরায় উর্বর হয়ে উঠত। এভাবে নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের ভূমি চির-উর্বর থাকত।

এখানে অনাবৃষ্টির সমস্যা কৃষিজীবীদের ভাবিয়ে তুলত না। তারা সহজেই নদীর জলের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করত।

এভাবে নদীতীরবর্তী অঞ্চলে কৃষিজীবী সমাজের লোকদের নূতন কৃষিক্ষেত্রের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হ'ত না। তারা স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করতে পারত।

নদীতীরবর্তী কৃষিক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় কৃষির উৎপাদন অত্যধিক বৃদ্ধি পেত। উৎপাদন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, উদ্বৃত্তও বাড়ত। সেগুলি অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির বিকাশের পক্ষেও সহায়ক ছিল।

নদীতীরবর্তী অঞ্চলে জলপথে পরিবহণের সুযোগ বেশি থাকায়, তা যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষেও উপযোগী ছিল।

এসব নানা কারণেই নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতেই সভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। তার প্রমাণ মেসোপটেমিয়া, মিশর, আমাদের সিন্ধু-নদের তীরবর্তী অঞ্চল এবং চীনের হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। এগুলিতেই সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল।

প্রশ্নাবলী

১। ব্রোঞ্জ কাকে বলে? এর উপযোগিতা কি?

২। তামা-ব্রোঞ্জের ব্যবহার দ্রুত প্রচলিত হয়েছিল কেন?

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জযুগ কাকে বলা হয়? ঐ যুগ কখন শুরু হয়েছিল এবং কতদিন স্থায়ী হয়েছিল?

৪। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন এবং কেন ঘটেছিল?

৫। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছিল কেন? সমাজে ব্যবসায়ী শ্রেণীর গুরুত্ব কি?

৬। শহরগুলির উদ্ভব হয়েছিল কিভাবে?

৭। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য দেখা দিয়েছিল কেন? পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল কিভাবে?

৮। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কিভাবে রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল?

চতুর্থ অধ্যায়

সুপ্রাচীন সভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ ৩০০ থেকে ১৫০০ অব্দ)

॥ ক ॥

মেসোপটেমিয়া

১

ভৌগোলিক অবস্থান—সভ্যতার প্রাচীনতা

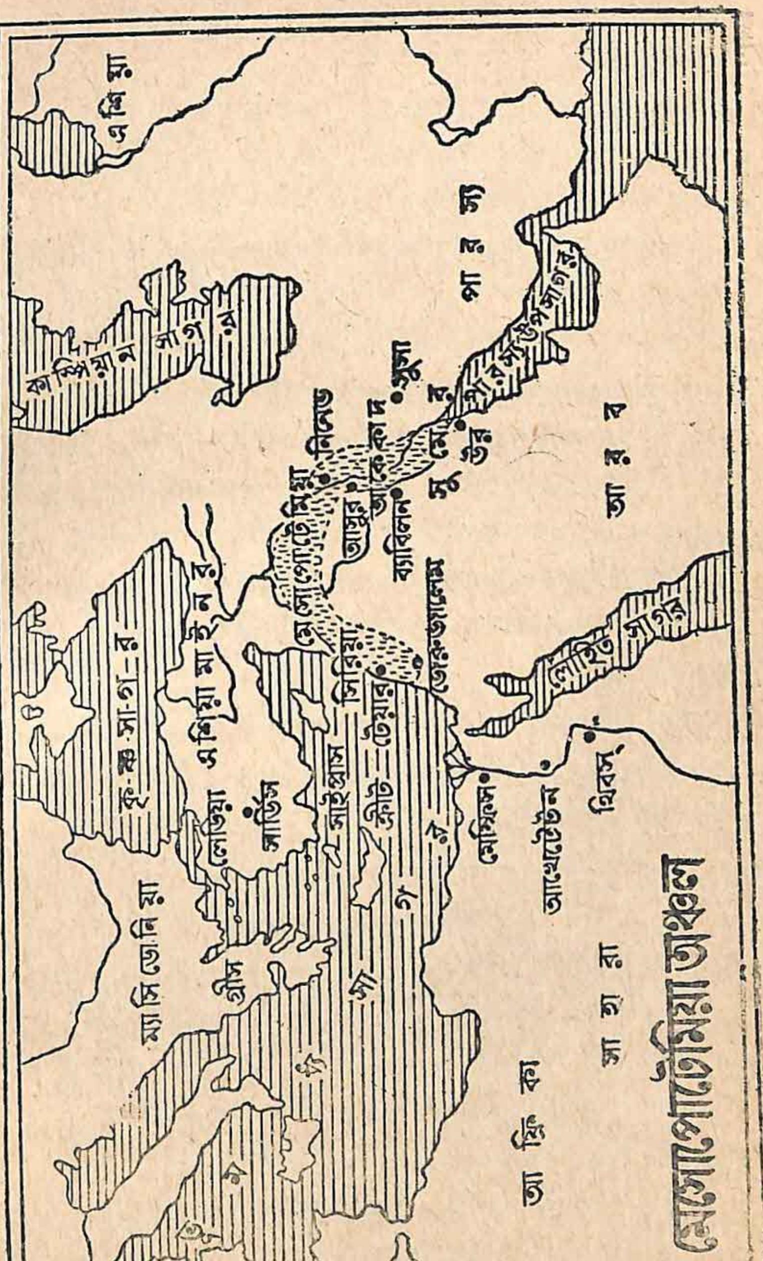
আরবদেশের উত্তর-পূর্বে ও পারস্যের পশ্চিমে **মেসোপটেমিয়া** অবস্থিত। 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। এই দুই নদী হ'ল **টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস**। এই নদী দুটি উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে পারস্যোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

এই নদী দুটির মোহনার কাছে গঠিত উর্বর অঞ্চলের নাম **সুমের**। সমগ্র মেসোপটেমিয়া অঞ্চল উর্বর হ'লেও মনে হয় সুমেরেই মানব সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল সর্বাগ্রে। এখানে বহু 'টেল' বা টিলা রয়েছে। এগুলো এক-একটি ছোটখাটো পাহাড়ের মতো। কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ বার বার একই জায়গায় বসতি স্থাপন করায়, এইসব স্থান এমন উঁচু হয়েছে। ঐসব 'টেল' বা টিলা খুঁড়ে মাটির বিভিন্ন স্তরে পর পর বহু জনবসতির চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন, এখানে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল এবং এখন থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে পৃথিবী প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

২

ভূমির উর্বরতা—বন্যানিরোধ ব্যবস্থা—কৃষিজাত দ্রব্য

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতে প্রবল বন্যা হওয়ায় মেসোপটে-মিয়া অঞ্চল খুবই উর্বর হয়ে উঠেছিল। বন্যার ফলে বার বার পলি পড়ায় এই অঞ্চলের উর্বরতাও ছিল চিরস্থায়ী। তাই কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে এই স্থান খুব লোভনীয় ছিল।


কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়া মাইনর
মেসোপোটেমিয়া
নিনেভ
আসুর
আক্কাদ
সুসা
ব্যাবিলন
সুমের
উর
পারস্য
পারস্য উপসাগর
আরব
লোহিত সাগর
সিরিয়া
টেয়ার
জেরুজালেম
সাইপ্রাস
ক্রীট
লিডিয়া
সার্ডিস
গ্রীস
ম্যাসিডোনিয়া
মেমফিস
আখেটেটন
থিবস
সাহারা
আফ্রিকা
মেসোপোটেমিয়া অঞ্চল

কিন্তু জমি উর্বর হ'লেই তা কৃষির ও বসবাসের উপযুক্ত হয় না। এখানে প্রায়ই প্রবল বন্যা হওয়ায় বাসস্থান ও কৃষিক্ষেত্রগুলি ভেসে যাওয়ার ভয় ছিল। তাছাড়া, এই অঞ্চল ছিল জলে, কাদায়, বালিতে ও নলখাগড়ার জঙ্গলে ভরা। এই অঞ্চলকে কৃষির উপযোগী ক'রে তোলা বেশ শ্রম ও সময়সাপেক্ষ ছিল।

মেসোপটেমিয়ায় বসতিস্থাপনকারী উপজাতিগুলির নিশ্চয় ধৈর্য, শ্রমশক্তি ও সহিষ্ণুতার অন্ত ছিল না। এই জলাভূমিতে মাছ ও পাখির অভাব ছিল না। তাছাড়া, এখানে বালিয়াড়িগুলিতে ছিল অজস্র খেজুরের গাছ। খেজুর অত্যন্ত উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। তাই খেজুর, মাছ ও জলচর পাখির মাংসে উদরপূর্তি করে প্রথম যুগের বসতিস্থাপনকারীরা এখানে দলবদ্ধভাবে বন্যানিরোধের কাজে মন দিল। তারা গড়ে তুলল বন্যানিরোধের জন্য বড় বড় বাঁধ, জল-নিকাশের জন্য বড় বড় খাল এবং সেচের ব্যবস্থা। এইভাবে তারা উচ্চস্থানে নিরাপদ আশ্রয় এবং তার চারিদিকে সুন্দর সুন্দর কৃষি-ক্ষেত্রগুলি রচনা করল।

ঐসব কৃষিক্ষেত্রে সম্ভবত গোড়ার যুগে তারা যবের চাষই করত। পরে গম, তিসি প্রভৃতিরও চাষ করতে থাকে এবং গ'ড়ে তোলে বড় বড় খেজুর বাগান।

৩

অন্যান্য বৃত্তির বিকাশ

এখানে কৃষিজীবীরা বসতি স্থাপন করেছিল। সেই সঙ্গে তারা পশুপালন করত। এখানে প্রাচীন সভ্যতার যেসব চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি থেকে বোঝা যায়, এখানকার মানুষ অন্যান্য বৃত্তিতেও সুপটু হয়ে উঠেছিল। তারা সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র রচনা করত। তারা বয়ন শিল্পেও বেশ উন্নত ছিল।

তারা গোড়ার যুগে নলখাগড়া-জাতীয় গাছের ডাঁটার উপর কাদার প্রলেপ দিয়ে বাড়িগুলি তৈরি করত। পরে তারা রোদে শুকানো ইট দিয়ে বাড়ি, মন্দির প্রভৃতি করত। নলখাগড়া-জাতীয়

গাছের ডাঁটার আঁটিতে কাদার প্রলেপ দিয়ে দেওয়াল তৈরি করায় এরাই সম্ভবত পৃথিবীতে প্রথম খিলানের আবিষ্কার করেছিল। মন্দিরগুলির নির্মাণ-কৌশল দেখলে বেশ বোঝা যায়, এখানে গৃহ-নির্মাণশিল্পে এক শ্রেণীর দক্ষ কারিগর নিযুক্ত থাকত।

এরা তামা-ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। তাই এখানে একদল লোক ধাতুশিল্পেও দক্ষ হয়ে উঠেছিল।

এই অঞ্চলে পাথর, ধাতু ও কাঠ দুষ্প্রাপ্য ছিল। কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়েই সেগুলি সংগ্রহ করতে হ'ত। তাই এক শ্রেণীর লোকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল পরিবহণ-ব্যবস্থার। তাতেও এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকত।

প্রত্যেক নগরেই অধিষ্ঠাতা দেবতার মিনার ও মন্দির থাকত। সেগুলিতে দেবার্চনা ও দেবতার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকত পুরোহিত শ্রেণীর লোক। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মন্দিরের ধনসম্পত্তির হিসাব রাখার কাজেও এক শ্রেণীর লোক ব্যস্ত থাকত।

উপজাতিসমূহের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। বাইরের উপ-জাতিগুলিও এসে হানা দিত। তার প্রতিরোধের জন্য গড়ে উঠেছিল সৈন্যদল। সৈনিক বা সেনানীর কাজেও বহু লোক নিযুক্ত থাকত।

মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে এ সমস্ত বৃত্তিই অপরিহার্য ছিল। সুমের-এ এই সকল বৃত্তিরই লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল।

৪

মানব সভ্যতায় সুমেরীয়দের দান

সুমের অঞ্চলে সমস্ত ভূমিকেই দেবতার সম্পত্তি মনে করা হ'ত। তাই দেবতার উপাসনা, দেবতার উদ্দেশে মিনার ও মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি সুমেরীয়দের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। সুমেরীয়রা ঠিক কোন্ জাতীয় লোক ছিল, তা বোঝা

যায় না। তবে সম্ভবত তারা কোনও পার্বত্য অঞ্চল থেকেই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। পার্বত্য অঞ্চলে তারা পর্বতের চূড়ায় দেবতার উপাসনা করত। সুমেরের সমতলভূমিতে উচ্চ পর্বত না থাকায় তারা পর্বতের অনুকরণে সুউচ্চ মিনার গড়ে তুলত। এই মিনারগুলিকে বলা হয় জিগ্‌গারট্। জিগ্‌-গারটের তলদেশ খুবই বিস্তৃত। তারপর তা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উপরে উঠে গেছে। জিগ্‌গারটের চূড়ায় থাকত দেবতার মন্দির। ঐ মন্দির বহু দূর থেকে দেখা যেত। মিনারের চূড়ায় ওঠার কোন সিঁড়ি ছিল না। মিনারের গা বেয়ে থাকতো কুণ্ডলীর আকারে পাকানো আলিসার মতো পথ। ঐ পথ দিয়েই মন্দিরের উপরে উঠতে হ'ত।

সুমেরীয়রা বহু মন্দির-ও নির্মাণ করেছিল। মন্দিরগুলি রোদে-শুকানো ইটের উপর আলকাতরার আস্তর দিয়ে তৈরী করা হ'ত। মন্দিরগুলির ইটের গাঁথুনিকে জমাট ও মজবুত করার জন্য ইটের সারির ফাঁকে ফাঁকে জোর ক'রে পোড়া মাটির গোঁজ ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। পোড়া মাটির গোঁজগুলি বর্ণবিচিত্র হওয়ায় মন্দির-গাত্রগুলি সুন্দর শোভা ধারণ করত। মন্দিরগুলির অভ্যন্তরে দেওয়ালগুলিতে থাকত অপূর্ব সব চিত্র ও নকশা। অনেক সময় ধাতুর পাত ও হাতির দাঁতের ওপর নকশা ক'রে সেগুলিকে আলকাতরা দিয়ে দেওয়ালের গায়ে এঁটে দেওয়া হ'ত।

দেবতার প্রসন্নতার জন্য সুমেরীয়রা যেমন মিনার ও মন্দির নির্মাণ করত, দেবার্চনা করত, তেমনি তারা জাদুশক্তিতেও বিশ্বাস করত। এজন্য তারা অনেক সময় বহুমূল্য পাথর বা রত্ন ব্যবহার করত। রত্নগুলিতে অনেক সময় ছিদ্র করা হ'ত। ঐসব নকশা-কাটা মূল্যবান্ পাথর অনেক সময় ব্যক্তিগত সীলমোহর রূপে ব্যবহৃত হ'ত। এই-ভাবে সুমের-এ রত্নশিল্প খুবই উন্নত হয়েছিল।

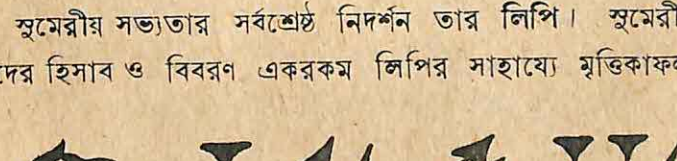
সুমেরীয়রা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা ও সীসার ব্যবহার জানত। তারা কেবল তামা-ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রই নির্মাণ

করত না, তারা সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দিয়েও সুন্দর সুন্দর গহনা তৈরি করত। এইগুলির সূক্ষ্ম নকশা ও সুষম গঠন দেখে বোঝা যায়, সুমেরীয়রা ধাতুশিল্পে বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল।

সুমেরীয়রা ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত ছিল। মেসোপটেমিয়ার বাইরে বিভিন্ন স্থানে তাদের তৈরী অনেক শৌখিন দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সুমেরীয় সওদাগররা যে সেগুলি ঐসব দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত, এ থেকে তা বোঝা যায়। সুমের অঞ্চলে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলের সীলমোহর পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায়, এখানে ভারতীয়রাও ব্যবসা করতে আসত।

সুমেরীয়রা চাকার ব্যবহার জানত। তাই তারা গাধা বা গোরুতে টানা গাড়ি পরিবহণের জন্য ব্যবহার করত। গাধা ও গোরু মালবাহী পশুরূপেও ব্যবহৃত হ'ত। সুমেরীয়রা ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। তারা গাধার পিঠে চড়ে বেড়াত। সুমের নদীর তীরে ও সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় সুমেরীয়রা জলপথেও যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। অনেকে মনে করেন, সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে তাদের ব্যবসা জলপথেই হ'ত। জলপথে যাতায়াতের জন্য তারা বড় নৌকা তৈরি করত। নৌকাগুলি কেবল দাঁড় নয়, পালের সাহায্যেও চলত।

সুমেরীয় সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন তার লিপি। সুমেরীয়রা তাদের হিসাব ও বিবরণ একরকম লিপির সাহায্যে মৃত্তিকাফলকে



কীলকাকার লিপি

লিখে রাখত। কোন বস্তু বোঝাতে তারা সম্ভবত গোড়ার দিকে ছবিই ব্যবহার করত। পরে সেগুলিকে সাংকেতিক ও সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে এই লিপির উদ্ভব হয়। লিপিগুলি কাঁচা মাটির

ওপর কাঠি দিয়ে লেখা হ'ত। তাই সেগুলি বাঁকা বা গোলাকার হ'ত না। কতকটা কীলক বা গোঁজের মতো হ'ত। তাই সুমেরীয় প্রাচীন লিপিকে পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন **কিউনিফর্ম** বা **কীলকাকার লিপি**। লেখার পরে কাঁচা মাটির ফলকগুলি পুড়িয়ে নেওয়া হ'ত। তাই ঐ লিপিতে লেখা অসংখ্য মৃত্তিকাফলক আজও রয়েছে। ঐগুলির আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের ফলে মেসোপটেমিয়ার সুপ্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কথাই নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।

প্রশ্নাবলী

১। মেসোপটেমিয়া কোথায় অবস্থিত? মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? কোন্ অঞ্চলের নাম সুমের?

২। কোন্ যুগে সুমের সুসভ্য হয়ে উঠেছিল?

৩। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে কেন কৃষিজীবীরা বসতি স্থাপন করেছিল?

৪। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের বসবাস ও কৃষির জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছিল?

৫। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের প্রধান ফসল কি ছিল?

৬। মেসোপটেমিয়ায় সেই সুপ্রাচীন কালেও কৃষি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তির বিকাশ ঘটেছিল কেন? কি কি বৃত্তি বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছিল?

৭। 'জিগ্ গারট' কি? কেন সুমেরীয়বাসীরা জিগ্ গারট নির্মাণ করত? জিগ্ গারটের আকার সম্পর্কে কি জান লিখ।

৮। সুমেরীয় মন্দিরগুলির গঠন ও শিল্প নৈপুণ্য বর্ণনা কর।

৯। সুমেরীয়রা ধাতুশিল্পে ও রত্নশিল্পে কেন খুবই উন্নত হয়েছিল?

১০। সুমেরীয় লিপি কি? একে কি লিপি বলা হয়? এই লিপি সম্পর্কে যা জান লিখ।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মেসোপটেমিয়ায় কৃষিজীবীরা যখন বসতি স্থাপন করেছিল, তখন ঐ অঞ্চল —, —, — ও — জাতীয় গাছে পূর্ণ ছিল। বালিয়াড়িগুলিতে ছিল — গাছ। তার ফল অতিশয় — ও —।

(খ) সুমেরীয়রা দেবতার উদ্দেশে যে মিনার গড়ত তার নাম —। এর তলদেশ ছিল —, ক্রমেই — হয়ে এটি অতিশয় উচ্চ হ'ত। এর চূড়ায় ছিল —। এতে ওঠার জন্য — ছিল না। এর গা বেয়ে পাক দিয়ে — আকারে — থাকত।

(গ) সুমেরীয়রা যে লিপি ব্যবহার করত, তাকে বলা হ'ত — লিপি। এই লিপি — — উপর — দিয়ে লেখা হ'ত। তাই লেখাগুলি — বা — না হয়ে হ'ত — মতো। লেখা হয়ে গেলে মৃত্তিকাফলকগুলিকে — হ'ত।

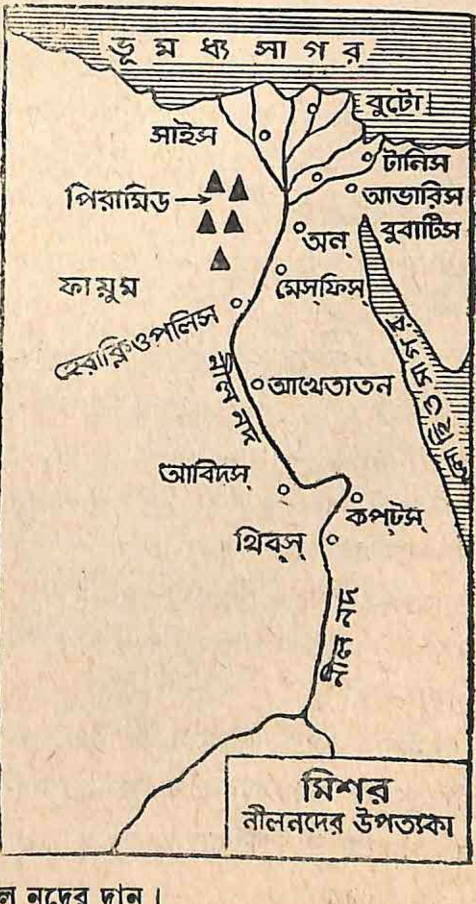
॥ খ ॥

মিশর

১

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে মিশর অবস্থিত। দক্ষিণে আফ্রিকার অভ্যন্তরে নিউবিয়ার পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে নীল নদের উত্তরে ভূমধ্য-সাগরে গিয়ে পড়ছে। এই নদীতে প্রতি বৎসর বন্যার ফলে নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হয়ে উঠেছে উর্বর। নদী-তীরবর্তী এই উর্বর ভূমিখণ্ডের দু-দিকেই প্রস্তরময় বালুময় মরুভূমি। নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলকেই বলা হয় **নীল নদের উপত্যকা**। এই উপত্যকার ভূমির উর্বরতার মূলে রয়েছে নীল নদের বন্যা।



তাই মিশরকে বলা হয় **নীল নদের দান**।

নীল নদে বৎসরে একবার সুনির্দিষ্ট সময়ে বন্যা হয়। তাই মেসোপটেমিয়ার মতো এখানে বন্যারোধের প্রশ্ন বড় নয়। এই অঞ্চল বিশুষ্ক ও বৃষ্টিহীন। এই উর্বর ভূমিতে চাষের খুব অসুবিধা হল—সেচের সমস্যা। নদীর বুক থেকে তীরবর্তী অঞ্চল বেশ উঁচু হওয়ায়, সেচের সমস্যা আরো কঠিন। বন্যার সময়ে নদীর জল আটক রেখে এবং ঐ জলকে উঁচু জমিতে তুলে সেচের ব্যবস্থা করলে চাষের কোনই অসুবিধা নেই। যে মানুষরা নীল নদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা এইসব সমস্যার সমাধান করেছিল। তারা গভীর নদী থেকে জল তোলা এবং সেই জলকে নালার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে প্রবাহিত করার জন্য এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছিল। এর ফলে, মিশর এক সুবিশাল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু এই সেচ-ব্যবস্থা কারও একার পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। যেসব উপজাতি এখানে বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের মিলিত চেষ্টায় এই অঞ্চল কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। এখানে গম, যব, শণ প্রভৃতি ছিল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

২

ফারাও—পুরোহিত—লিপি—লিপিকর—কর-সংগ্রাহক—শ্রমিকবাহিনী

ফারাও: নীল নদের উপত্যকায় বহু কৃষিজীবী উপজাতি বাস করত। এরা নিজ নিজ নগর ও জনপদ গড়ে তুলেছিল। এইসব উপজাতির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত এবং এক উপজাতি অন্য উপজাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। অনেক সময় কোন একটি উপজাতি খুবই শক্তিশালী হয়ে, বহু উপজাতির উপর আধিপত্য বিস্তারও করত।

নীল নদের উপত্যকা প্রধান দুভাগে বিভক্ত ছিল—দক্ষিণে নীল নদের তীরবর্তী দীর্ঘ সংকীর্ণ সমভূমি অঞ্চল এবং উত্তরে নীল নদ যেখানে কয়েকটি ধারায় ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে, সেখানকার ব-দ্বীপ অঞ্চল।

প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব দেবদেবী ছিল। এইসব দেবদেবী ছিল আধা-জন্তু এবং আধা-মানুষ। উত্তরের সর্প-দেবতার উপাসক একটি উপজাতির দলপতি কালক্রমে উত্তরের ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এইভাবে উত্তরে একটি মিশরীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণের বাজপাখির উপাসক একটি উপজাতির দলপতি দক্ষিণ অংশের উপজাতিদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এইভাবে মিশরে উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কিংবদন্তী অনুসারে, দক্ষিণ রাজ্যের অধিপতি **মেনেস** উত্তর রাজ্য জয় ক'রে মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ঐক্যবদ্ধ মিশরের রাজারা ফারাও নামে পরিচিত হতেন। ফারাও শব্দের মূল অর্থ—যিনি বড় বাড়িতে থাকেন।

ফারাওরা তাঁদের উপজাতীয় দেবতার প্রতীক ধারণ করতেন। দেবতার প্রতীক ধারণ করায় তাঁরা জীবন্ত দেবতা বলে গণ্য হতেন।

ফারাওরা জীবন্ত দেবতা বলে গণ্য হওয়ায়, তাঁরা দেববংশের লোক ছিলেন। তাই দেববংশের বাইরে সাধারণ রক্তমাংসের মানুষকে বিবাহ করা তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য ফারাওকে নিজের বোন, সৎবোন, পিসী, মাসী প্রভৃতিকে বিবাহ করতে হ'ত।

ফারাওরা দেবতা ও দেববংশের লোক বলে গণ্য হ'লেও, তাঁরা সকলে একবংশের লোক ছিলেন না। মিশরে একত্রিশটি রাজবংশ কয়েক হাজার বছর ধ'রে রাজত্ব করেছিলেন। বিদেশী পারসিক ও গ্রীকরা মিশর জয় করলে, তাঁরাও ফারাও এবং দেবতা ব'লে গণ্য হ'য়েছিলেন।

পুরোহিত ঃ ফারাওদের পর মিশরে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন পুরোহিতরা। মিশরীয়রা দেবদেবীতে খুবই বিশ্বাস ক'রত। দেবদেবীরা তাঁদের মনোভাব পুরোহিতদের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতেন—এরূপ বিশ্বাস মিশরীয়দের ছিল। মিশরীয়রা যেমন ফারাওকে রাজ-কর দিত, তেমনি মন্দিরেও দেবদেবীকে প্রসন্ন রাখতে

দেবতার প্রাপ্য দিত। তাই প্রতি মন্দিরে বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চিত হ'ত। পুরোহিতরা এইসব ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তাঁরা নানা দৈবশক্তি ও জাদুশক্তির অধিকারী ব'লেও মিশরীয়রা বিশ্বাস করত।

তা ছাড়া, পুরোহিতরা ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। নীল নদে বন্যা প্রতি বৎসর একই সময়ে হ'ত। একটি বন্যার পর থেকে পরবর্তী বন্যা পর্যন্ত দিন গণনা ক'রে, তাঁরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে, ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়। তাঁরাই ৩০ দিনে মাস গণনা ক'রে বারো মাসের প্রবর্তন করেন। বাকি পাঁচদিন উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। তাঁরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৌর বৎসর গণনা শুরু করেন। খ্রীষ্ট পূর্ব ৪২৪১ অব্দ থেকে এই বর্ষগণনা শুরু হয়।

বৎসরের দিনগুলি গণনা ক'রে তাঁরা প্রথম থেকেই ব'লে দিতেন, কবে নীল নদে বান আসবে। এই ব্যাপারকে মিশরীয় জনসাধারণ দৈবীশক্তি ব'লেই বিশ্বাস ক'রত।

লিপি ঃ মন্দিরের ধন-সম্পদের হিসাব ও অন্যান্য বিবরণ লিখে রাখার জন্য মিশরীয় পুরোহিতরা এক ধরনের লিপি আবিষ্কার করেন। ঐ লিপিও গোড়ার দিকে চিত্রাক্ষর ছিল। পরে ছবিগুলি সংক্ষিপ্ত



মিশরের হায়েরোগ্লিফিক লিপি

ও সাংকেতিক করায়, ঐগুলি অক্ষরের রূপ পায় এবং শেষে ঐগুলি কেবল বস্তুসূচক না থেকে ধ্বনিসূচকও হয়ে ওঠে। এই

লিপি প্রধানত পুরোহিতরা মন্দিরের কাজেই ব্যবহার করতেন। তাই এই লিপিকে বলা হয় **হায়েরোগ্লিফিক** বা পবিত্র লিপি। প্যাপিরাস নামে নলখাগড়া জাতীয় গাছের ডাঁটা জুড়ে তার ওপর কালি দিয়ে লেখা হ'ত। এই প্যাপিরাস কথা থেকেই ইংরাজী 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি।

এখনকার লিপির সঙ্গে এই লিপির কোনও সাদৃশ্য নেই। তবু পণ্ডিতরা প্রাণপাত ক'রে এই লিপি পড়বার কৌশল আবিষ্কার করেছেন। এই লিপিতে লেখা বহু পুঁথি মিশরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে। তা থেকে মিশরের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস প্রায় নিশ্চিতভাবে জানা গেছে।

লিপিকর ঃ মিশরে লিপির প্রচলন থাকায় হিসাব-নিকাশ ও বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ লিখে রাখা হ'ত। ঐভাবে লিখে রাখার জন্য দেশে এক শ্রেণীর লিপিকর ছিল। লিপিকররাই ছিল প্রকৃতপক্ষে সে যুগের শিক্ষিত শ্রেণী।

কর-সংগ্রাহক ঃ ঐ সময়ে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তাই মিশরীয়রা বস্তুতেই কর দিত। সেজন্য সারা দেশে কৃষিজাত দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য এবং পশুপক্ষী কর রূপে গৃহীত হ'ত। এজন্য দেশে বিশাল বিশাল ভাণ্ডার এবং পশুপালা ও পক্ষিশালা থাকত। কেবল কর-সংগ্রহ নয়, ঐসব ভাণ্ডার, পশুশালা প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাব-নিকাশও কর-সংগ্রাহকদের করতে হ'ত। তাই রাজকর্মচারি-রূপে কর-সংগ্রাহকদের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল।

শ্রমিক-বাহিনী ঃ ফারাওরা দেশে প্রচুর পরিমাণে পথঘাট, প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করতেন। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ঐসব কাজে নিযুক্ত থাকত। রাজার ও মন্দিরের ভাণ্ডার থেকে তাদের নিয়মিত খাদ্যাদি জোগানো হ'ত। নীল নদে বন্যার সময়ে যখন চাষের কাজ বন্ধ থাকত, তখন কৃষকরাও এই কাজ করত। ক্রীতদাসদেরও এই কাজে খাটানো হ'ত।

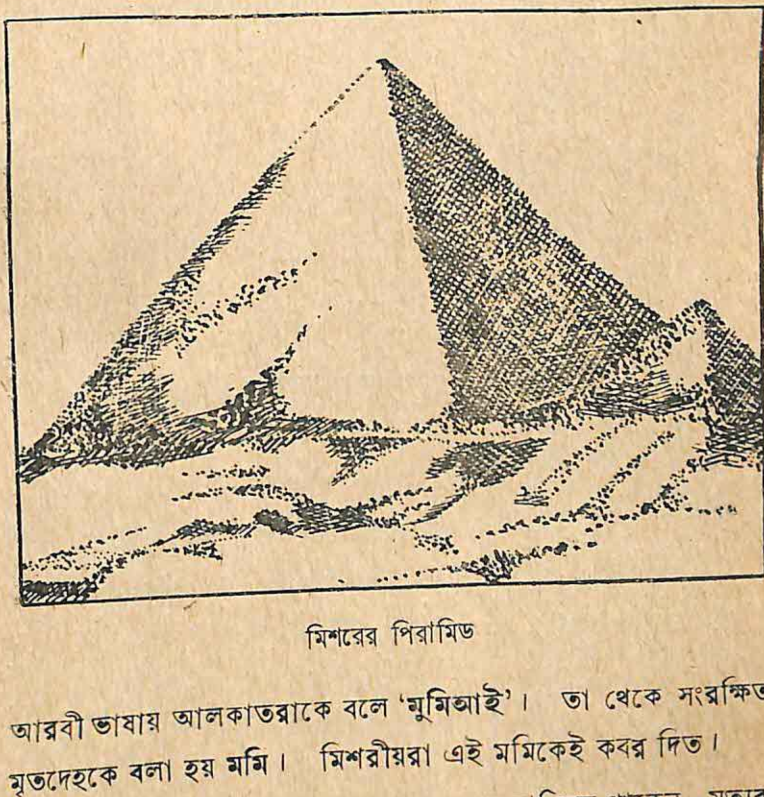
৩
ব্যবসায়-বাণিজ্য

মিশরের ভূমি উর্বর হওয়ায় তার শস্য-সম্পদের অভাব ছিল না। নীল নদের উপত্যকার দু'ধারেই প্রস্তরময় অঞ্চল থাকায়, তার পাথরেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তার কাঠ ও সম্পদ বেশি ছিল না। এইসব জিনিস তাদের বাহির থেকে আমদানি করতে হ'ত। ব্যবসায়-বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই হ'ত। সেজন্য মিশরীয় ব্যবসায়ীরা দেশের কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে এগুলি দূর দূর দেশ থেকে সংগ্রহ ক'রে আনত। মিশরীয় অভিজাতরা খুবই শৌখিন ছিলেন। মিশরীয়রা যাদুশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। জাদুগুণের জন্য মিশরীয়রা নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন ও অঞ্জন বাহির থেকে আমদানি করত। মিশরীয়রা স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করত। তাদের বাণিজ্য-পোত ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর ও নীল নদে পাড়ি দিত। জাহাজগুলি আকারে বেশ বড় ছিল। তারা আফ্রিকার অভ্যন্তরে নিউবিয়া থেকে মূল্যবান কাঠ, সুগন্ধি দ্রব্য, সোনা, হাতির দাঁত প্রভৃতি আনত। তাদের বাণিজ্যতরী ক্রীট ও সাইপ্রাস দ্বীপে যেত। সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তারা নীল নদের একটি শাখাকে খালের দ্বারা লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছিল। নৌকা ও জাহাজ দাঁড় ও পালের সাহায্যে চলত।

৪
পিরামিড

মিশরীয়রা নব-প্রস্তর যুগের মানুষের মতোই মৃত্যুকে জীবনের শেষ মনে করত না। তারা মনে করত, মৃত্যুর পরেও মানুষের আর এক জীবন আছে, যে জীবনে তার জীবিত অবস্থার মতোই সব কিছুর প্রয়োজন হয়। যতদিন তার দেহ নষ্ট না হয়, ততদিন তার মৃত্যুর পরবর্তী জীবনও চলতে থাকে। তাই মিশরীয়রা মৃতদেহ যাতে মৃত্যুর পর নষ্ট না হয়, সেজন্য চেষ্টা করত। মৃতদেহগুলিকে তারা সোরার

জলে ডুবিয়ে রেখে নাড়িভুঁড়ি বার ক'রে নিয়ে ভেতরটা সম্ভবতঃ আলকাতরায় ভরে দিত। তারপর সারা দেহে পাতলা কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হ'ত। অবশ্য, আলকাতরার ব্যবহার নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় নি। চোখের গর্তে বসানো হ'ত উজ্জ্বল পাথর।



মিশরের পিরামিড

আরবী ভাষায় আলকাতরাকে বলে 'মুমিআই'। তা থেকে সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হয় মমি। মিশরীয়রা এই মমিকেই কবর দিত।

ইহলোকে রাজা-রাজড়ারা যেমন বড় বড় বাড়িতে থাকেন, মৃত্যুর পরও চাই তাঁদের সেইরূপ বড় বড় বাড়ি। তাই মাটির তলায় তাঁদের জন্য বহুকক্ষবিশিষ্ট বড় বড় কবর তৈরি হ'ত। তাতে দেওয়া হ'ত তাঁদের ব্যবহার্য সকল জিনিস—খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ, ধনরত্ন, অস্ত্র-শস্ত্র, দাস-দাসী, অনুচর-পরিচর পর্যন্ত। গোড়ার দিকে দাস-দাসী, অনুচর-পরিচারকদের হত্যা ক'রে কবরে দেওয়া হ'ত। পরে তাদের মূর্তি গড়িয়ে দেওয়া হ'তে থাকে।

এই বহু কক্ষবিশিষ্ট কবরের ওপরেই নির্মিত হ'ত পাথরের সুউচ্চ ত্রিকোণাকার পাথরের স্তূপ। এরই নাম পিরামিড।

ফারাওরা নিজেদের পিরামিড নিজেরাই নির্মাণ ক'রে যেতেন। এজন্য তাঁরা বিপুল ধনদৌলত ব্যয় করতেন। এইসব পিরামিডের অনেকগুলি আজও আছে। এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ফারাও খুফু যে পিরামিডটি নির্মাণ করেছিলেন, পিরামিডগুলির মধ্যে সেটিই বৃহত্তম। পিরামিডটি নীল নদের পশ্চিমে গিজে নামক স্থানে অবস্থিত। এটির তলদেশ প্রায় তের একর। উচ্চতা সাড়ে চার শ' ফুট। এটি নির্মাণ ক'রতে প্রায় আড়াই টন ওজনের তেইশ লক্ষ পাথর লেগেছে। পাথরের ওপর পাথরগুলি এমন নিখুঁতভাবে বসানো যে, দুটি পাথরের মধ্যে একচুলও ফাঁক নেই।



মমি

নীল নদের পশ্চিম পাড়ে ঐ ধরনের পাথর নেই। আছে পূর্ব পাড়ে। সম্ভবত নীল নদ যখন বন্যার সময়ে পূর্ণ থাকত, তখন কাঠের ভেলায় ক'রে পাথরগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমপাড়ে আনা হয়েছিল। ঐ পাথরগুলি যে কিভাবে সে যুগে অত উঁচুতে তোলা হয়েছিল, তাও এক বিস্ময়। ইতিহাসের জনক হেরোডটাস বলেছেন, ঐ পিরামিডটি নির্মাণ করতে এক লক্ষ লোক বিশ বছর কাজ করেছিল। ঐসব লোকের মজুরী সবই রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হ'ত।

পিরামিডগুলি দেখলে বোঝা যায়, মিশর ঐ যুগে স্থাপত্যশিল্পে কি বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল!

পিরামিডের কক্ষগুলি ফারাওয়ের ব্যবহার্য মূল্যবান বস্তুতে এবং ধনদৌলতে পূর্ণ থাকত। পরবর্তীকালে ঐসব মূল্যবান বস্তু ও ধনরত্ন সব চুরি হয়ে গেছে। একমাত্র ফারাও তুতেনখামেনের পিরামিডটি দস্যু-তস্করের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এটির কোন জিনিস খোয়া যায় নি। এটি দেখেই পিরামিডের ভেতরকার বহু বিষয় জানা গেছে।

৫
মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস

প্রাকৃতিক শক্তির করুণার ওপর নির্ভর ক'রে মানুষকে যেমন বাঁচতে হ'ত, তেমনি নীলনদের এই উপত্যকায় বসতি স্থাপনকারী মানুষদের হিংস্র শ্বাপদ ও সরীসৃপদের করুণার ওপরও নির্ভর করতে হ'ত। তাই প্রাচীন মিশরীয়রা আধা-জীবজন্তু ও আধা-মানুষের আকারে তাদের দেবদেবীদের কল্পনা ক'রেছিল। প্রত্যেক উপজাতির থাকত ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী। এইভাবে বিভিন্ন উপজাতি জলহস্তী-দেবতা, কুম্ভীর-দেবতা, সর্প-দেবতা, বৃষ-দেবতা, শৃগাল-দেবতা, শ্যেন-দেবতা, শকুন-দেবতা প্রভৃতির পূজা ক'রত। সর্প-দেবতার উপাসক উপজাতি মিশরের উত্তরাংশে অন্যান্য উপজাতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করলে ঐ সব উপজাতি সর্প-দেবতাকেই তাদের প্রধান দেবতা ব'লে মেনে নেয়। দক্ষিণের শ্যেন-উপাসক উপজাতির রাজা মেনেস যখন সমগ্র মিশরে



ওসিরিস



দেবতা 'রা'

আধিপত্য বিস্তার করলেন, তখন শ্যেন-দেবতা **হোরাস** হয়ে উঠলেন সমগ্র মিশরের প্রধান দেবতা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটতে লাগল। মিশরীয়দের ধর্মচিন্তায় নানা নূতন ধ্যান-ধারণা দেখা দিল। শ্যেনপক্ষী আকাশবিহারী, তাই হোরাস হয়ে উঠলেন আকাশ-দেবতা। মিশরীয়রা যখন বিশ্বাস করতে লাগল, সূর্যই প্রাণের উৎস, তখন শ্যেন-দেবতা হোরাস এবং সূর্য-দেবতা আমন-রা এক হয়ে গেলেন।

দেবদেবীদের নিয়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠলো। পুরাণকাহিনীতে হোরাসকে আবার সূর্য দেবতার প্রপৌত্র ব'লে কল্পনা করা হ'লো। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে কল্পিত হলেন **ওসিরিস**। জীবন ও নীল নদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে কল্পিতা হলেন **আইসিস**। মিশরী পুরাণে বলা হ'লো, এঁরা সূর্য-দেবতার পৌত্র ও পৌত্রী—ভাই ও বোন, আবার স্বামী ও স্ত্রী। এঁদের পুত্র হলেন 'হোরাস।

ধর্মীয় ধারণায় ক্রমাগত নানা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। গাভী-দেবতা **হাথর** ও আইসিস এক হয়ে গেলেন। বৃষ-দেবতা **এপিস** ও সূর্য-দেবতা আমন-রা এক হ'লেন।

যাই হ'ক, **ওসিরিস ও আইসিস** এবং আমন-রা-ই মিশরে সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রধান দেবতা রূপে পূজিত হন।

মিশরে দেবদেবীর উদ্দেশে বহু মন্দির নির্মিত হয়। ঐসব মন্দিরের নির্মাণ কাজে ফারাওরা অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। মিশরের প্রাচীন দেবমন্দিরগুলির যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি দেখলেও বোঝা যায়, প্রাচীন মিশর স্থাপত্যশিল্পে কী বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল।

৬

প্রধান বৃত্তিসমূহ

মিশরীয়রা প্রধানত ছিল কৃষিজীবী। কৃষিজাত দ্রব্য ও খাদ্য উদ্‌বৃত্ত হওয়ায় এখানে বিভিন্ন শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল। মৃৎশিল্প,

বয়নশিল্প ও ধাতুশিল্পে এখানে অংসখ্য লোক নিযুক্ত থাকত। এখানে বহুলোক কাচশিল্পে এবং সুরা উৎপাদনে নিযুক্ত থাকত। মিশরীয়রা খুব শৌখিন হওয়ায় নানাপ্রকার বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজন হ'ত। ঐসব বিলাসদ্রব্য উৎপাদনেও বহু লোক নিযুক্ত থাকত।

মিশরে অংসখ্য প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। ঐগুলি নির্মাণ করতে অসংখ্য দক্ষ স্থপতি ও শ্রমিক নিযুক্ত থাকত। মিশরে নির্মিত দেবদেবী, ফারাও প্রভৃতির অপূর্ব মূর্তিগুলি দেখে বোঝা যায়, এক শ্রেণীর লোক মূর্তিনির্মাণে নিযুক্ত থাকত এবং মিশরে ভাস্কর্য কলা অতিশয় উন্নত হয়েছিল।

দেবদেবীর আরাধনায় এবং মন্দিরের ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে পুরোহিত শ্রেণীর লোকরা নিযুক্ত থাকতেন। হিসাব-পত্র ও বিবরণ রাখার জন্য ছিল লিপিকর শ্রেণী। কর-সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য বহু লোক রাজকার্যে নিযুক্ত থাকত। দেশরক্ষা ও দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শক্তিশালী সৈনাবাহিনী ছিল। সৈনিক ও সেনানীর কাজেও বহু লোক নিযুক্ত থাকত।

মিশরীয়রা ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল। তাই এক শ্রেণীর লোক ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা। পরিবহণেও এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকত। নৌ-বাণিজ্যে ও নৌ-চালনায় বহু লোক নিযুক্ত থাকত।

প্রশ্নাবলী

১। মিশর কোথায় অবস্থিত? এর ভূ-প্রকৃতি কিরূপ?

২। মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন?

৩। নীল নদের উপত্যকা প্রধান ক'ভাগে বিভক্ত? ভাগগুলি কিরূপ?

৪। 'ফারাও' বলতে কি বোঝ? 'ফারাও' শব্দের অর্থ কি? ফারাওদের দেবতা ভাবা হ'ত কেন? ফারাওরা নিজ পরিবারের মধ্যে বিয়ে করতেন কেন?

৫। মিশরীয় সমাজে পুরোহিতদের স্থান কিরূপ ছিল? ঐরূপ স্থানলাভের কারণ কি?

৬। পুরোহিতরা প্রধানতঃ কি কারণে দৈবী শক্তির অধিকারী ব'লে গণ্য হতেন ?

৭। পৃথিবীতে সৌর বৎসর গণনা কারা করেছিল ? কিভাবে করেছিল ? মিশরীয় বর্ষগণনা কবে থেকে শুরু হয়েছিল ?

৮। মিশরীয় লিপি বলতে কি বোঝ ? এই লিপিকে হায়েরোগ্লিফিক বলে কেন ? ঐ লিপিতে কিভাবে লেখা হ'ত। ঐ লিপি প্রাচীন মিশরীয়দের সম্পর্কে জানতে কিভাবে সাহায্য করেছে ?

৯। মিশরীয় লিপিদের সম্পর্কে কি জান ?

১০। মিশরীয় সমাজে কর-সংগ্রাহকদের কাজ কি ছিল ?

১১। প্রাচীন মিশরীয়দের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে কি জান ?

১২। পিরামিড কি ? কেন ঐগুলি নির্মিত হ'ত ? সবচেয়ে বড় পিরামিড কোন্‌টি ? ঐ পিরামিডটি কোথায় অবস্থিত ; কোন্ পিরামিডে কিছুই চুরি যায় নি ?

১৩। খুফু-নির্মিত পিরামিড সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৪। পিরামিডগুলি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে কেন ?

১৫। মিশরের মমি সম্পর্কে কি জান ?

১৬। মিশরীয় দেবদেবী সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৭। মিশরীয়দের কয়েকটি প্রধান দেবতার নাম কর।

১৮। মিশরীয়দের বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৯। বাক্যাংশগুলিকে ঠিক মতো সাজাও।

ফারাও শব্দের অর্থ	মিশরীয় পুরোহিতরা।
খুফু-নির্মিত পিরামিডটি	আরবী 'মুমিআই' শব্দ থেকে।
হায়েরোগ্লিফিক শব্দের অর্থ	এসেছে।
'মমি' শব্দটি এসেছে	মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দেবতা।
ওসিরিস হলেন	গিজে নামক স্থানে অবস্থিত।
সৌর বৎসর প্রথম গণনা করেন	পবিত্র লিপি।
	যিনি বড় বাড়িতে বাস করেন।

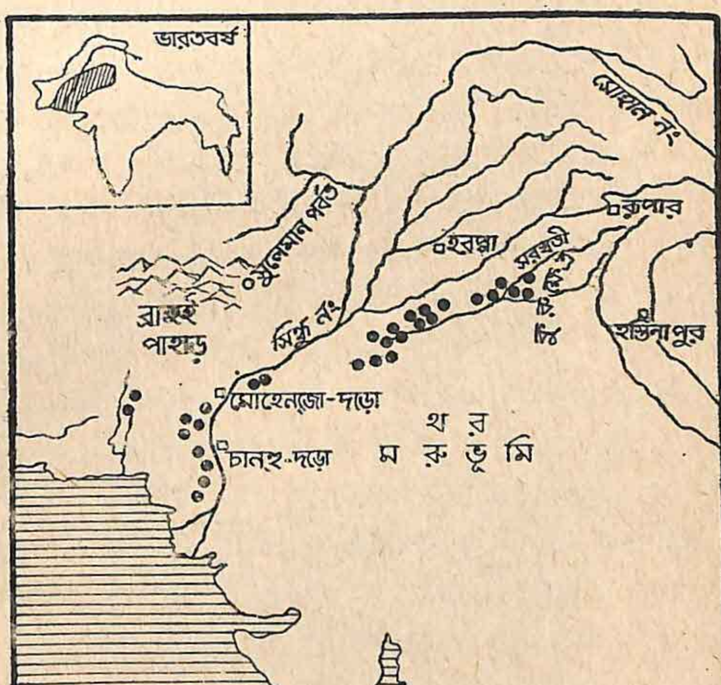
॥ গ ॥

সিন্ধু উপত্যকার সুপ্রাচীন সভ্যতা

১

আবিষ্কার ও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি

ভৌগোলিক অবস্থান : আর্য সভ্যতাকেই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা মনে করা হ'ত। কিন্তু এখন থেকে প্রায় ষাট বছর আগে সিন্ধু নদ ও তার উপনদীসমূহের তীরবর্তী অঞ্চলে কিছু প্রাচীনতর সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে সিন্ধু নদের তীরে মহেঞ্জো-



সিন্ধু সভ্যতা

দড়োতে এবং রাবী নদীর তীরে হরপ্পায় মাটির নীচে দুটি সু-প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ 'মৃতের স্তূপ'। মহেঞ্জোদড়োতে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্পায় ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি। পরে পার্শ্ববর্তী বহু স্থানেও খননকার্য চালানো হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বালুচিস্থানের এক সুবিশাল অঞ্চলে এক আশ্চর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

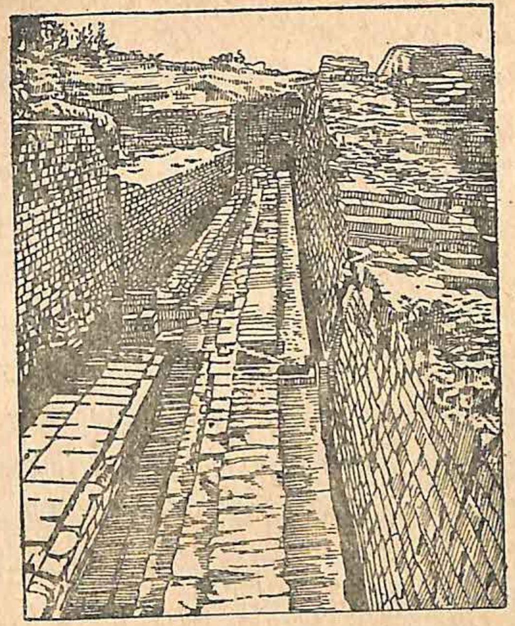
প্রাচীনতা ঃ এই অঞ্চল এখন বৃষ্টিহীন ও বিশুষ্ক হ'লেও প্রাচীন কালে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হ'ত। নদীগুলিতে প্রবল বন্যা নামত। মৃত্তিকা ছিল চির-উর্বর। তাই কৃষিজীবী মানুষরা এখানে এসে বসবাস করেছিল। মহেঞ্জোদড়োর প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা খোঁড়া হয়েছে। সেখানে মাটির তলায় পর পর কয়েকটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সম্ভবত বন্যায় কোন শহর নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ঐ স্থান পরিত্যক্ত থাকত। পলিমাটি পড়ে কালক্রমে যখন ঐ শহরের চিহ্ন লোপ পেয়ে যেত, তখন নূতন ক'রে আবার শহর গড়া হ'ত। এইভাবে একটি শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর আর একটি নূতন শহর গ'ড়ে উঠতে নিশ্চয় কয়েক শতাব্দী লাগত। তাছাড়া, এখানে তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা, সীসা প্রভৃতি ধাতুর জিনিস পাওয়া গেলেও লোহার কোন জিনিস পাওয়া যায়নি। এইসব থেকে বিচার ক'রে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন, এই সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেই বিকাশ পেয়েছিল।

আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি ঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় দুটি শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে ঘর-বাড়ি, পথ-ঘাট, নর্দমা, স্নানাগার, অসংখ্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, খেলনা, মূর্তি, সীলমোহর, ভুক্তাবশেষ প্রভৃতি। এগুলি থেকে ঐ প্রাচীন সভ্যতার উৎকর্ষ সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়।

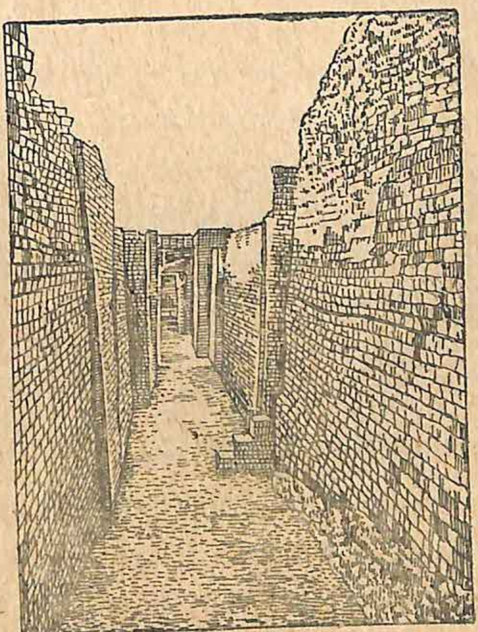
২

নগর-পরিকল্পনা

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের কৃষিক্ষেত্রগুলির কেন্দ্রস্থলে যেমন নগর গড়ে উঠেছিল, এখানেও তেমনি গ'ড়ে উঠেছিল নগর।



মহেঞ্জোদড়োয় নর্দমাসহ ইট বাঁধানো পথ



মহেঞ্জোদড়োয় সরু গলি পথ

তবে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় খননকার্য চালিয়ে বোঝা গেছে, এই নগরগুলি এলোপাথাড়ি গ'ড়ে ওঠেনি। কে বা কারা যেন বেশ পরিকল্পনা ক'রে শহরগুলিকে গড়ে তুলেছিল। মহেঞ্জোদড়োয় শহরের মাঝখান দিয়ে যে প্রধান রাজপথটি চ'লে গেছে, সেটি তেত্রিশ ফুট চওড়া। তা থেকে বেরিয়েছে সোজা, চওড়া, সমান্তরাল পথগুলি। পথের দুদিকে ঢাকা নর্দমা। তারপর সারি সারি বাড়ি। ছোট থেকে প্রাসাদোপম বড বাড়িও রয়েছে। দু-তিন-তলা বাড়ির চিহ্নও আছে। বাড়ির ওপর তলা থেকেও ছিল মলমূত্র নির্গমনের ব্যবস্থা। বাড়িগুলির সামনে ছিল আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা। সর্বত্রই পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সতর্কতা।

এখানকার অধিবাসীরা যে খুবই পরিচ্ছন্ন ও শৌখিন ছিল, তার প্রমাণ, মহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত বিখ্যাত স্নানাগারটি। এখানে যে স্নানাগারটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট এবং প্রস্থে ১০৮ ফুট। এর চারদিকেই ৮ ফুট পুরু দেওয়াল। স্নানাগারটির মধ্য-স্থলে ছিল ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর একটি চৌবাচ্চা। এই চৌবাচ্চায় স্নান ও সাঁতার দু-ই চলত। চৌবাচ্চায় নামার জন্য সিঁড়ি ছিল। চারিদিকে বসবার জন্য ছিল গ্যালারি। গ্যালারির পেছনে ছিল কামরা ও কামরাগুলির মধ্যে পাতকুয়া। পাতকুয়াগুলি থেকে চৌবাচ্চায় প্রয়োজনমতো জলের ব্যবস্থা ছিল। এখানে চুল্লির চিহ্ন-ও আছে। তা থেকে মনে হয় এখানে গরম জলে বা বাষ্পে স্নানের ব্যবস্থাও ছিল।

৩

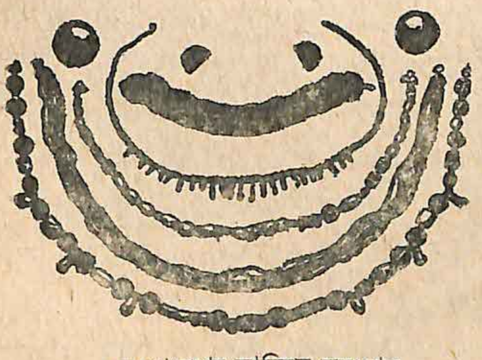
খাদ্য, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য, শিল্পসামগ্রী, ব্যবসায়-বাণিজ্য

খাদ্য : ভূগর্ভে যেসব ভুক্তাবশেষ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, ঐ সময় এখানকার লোকে গম, যব, খেজুর ও মাছ-মাংস খেত। গোরু ও মহিষের কঙ্কাল দেখে মনে হয়, এরা গোরু ও মহিষের দুধও খেত।

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ঃ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বর্ণবিচিত্র মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। মনে হয়, মৃৎশিল্পে এখানকার লোকে খুবই উন্নত ছিল। তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও চীনামাটির বাসনও পাওয়া গেছে।

এখানকার লোকে সুতো ও পশমের কাপড় ব্যবহার করত। ঐ গুলিরও চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। হাড় ও হাতি-দাঁতের সূচ, মাটি, চীনামাটি ও হাড়ের তৈরী মাকু ও কাটিম, ব্রোঞ্জের আয়না, তামা ও ব্রোঞ্জের দা, ছুরি, কুড়াল, ক্ষুর পাওয়া গেছে। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে ট্যাঙি, বর্শা, ছোরা, ছোট তলোয়ার, গদা প্রভৃতি।

শিল্পসামগ্রী ঃ শিল্পদ্রব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল



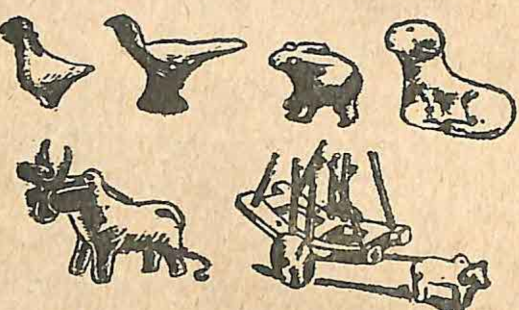
মহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত অলংকার



মহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত পাথরের মূর্তি

গহনা। বালা, হার, আংটি, দুল, তোড়া, নাকছাবি, প্রভৃতি বহুরকমের গহনা পাওয়া গেছে। এগুলির গড়ন খুবই সুন্দর।

আর পাওয়া গেছে, নানারকম খেলনা, পুতুল ও মূর্তি। খেলনা ও পুতুলের অধিকাংশই মাটির। পাথরের মূর্তিও আছে।



সিন্ধু-সভ্যতায় আবিষ্কৃত খেলনা

৪

ব্যবসায়-বাণিজ্য

সিন্ধু উপত্যকার সভ্য মানুষরা কৃষিতে ও শ্রমশিল্পে খুবই উন্নত ছিল। বিনিময়ের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় চলত। এখানকার লোকে বিদেশের সঙ্গেও ব্যবসা করত। এখানে পাঁচ শ'-রও বেশি সীলমোহর পাওয়া গেছে। এইসব সীলমোহর নিশ্চয় ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করত। এই ধরনের সীলমোহর মেসোপটেমিয়ায় ও এলামে (পারস্যে) পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, ঐসব অঞ্চলের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলত। আবার সুমেরীয় অঞ্চলের কিছু শিল্প-সামগ্রী, প্রসাধন দ্রব্য ও সীলমোহর সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায়, ঐসব অঞ্চলের লোকরাও সিন্ধু অঞ্চলে এসে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত।

সিন্ধু অঞ্চলের লোকেরা সমুদ্র-পথে পারস্য, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবসায় করত বলে মনে হয়। সিন্ধু অঞ্চলে উট এবং হাতির হাড় ও কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয়, ঐগুলি স্থলপথে যাতায়াত ও মাল বহনের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। খেলনা গোরুর গাড়ি থেকে বোঝা যায়, পরিবহণরূপে গোরুর গাড়িও ব্যবহৃত হ'ত।

এখানে অনেক বিভিন্ন ওজনের পাথরের টুকরো পাওয়া গেছে। ঐগুলি সম্ভবত বাটখারা-রূপে ব্যবহৃত হ'ত।

৫
ধর্ম ও উপাসনা

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো মন্দির ও দেবমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে মনে হয়, এখানকার লোক শিব-দুর্গার মতো কোন দেব-দেবীর উপাসনা করত। এখানে প্রাপ্ত একটি সীল-মোহরে তিন-মুখবিশিষ্ট বহু-পশুবেষ্টিত একটি যোগী-মূর্তি আছে, তা সহজেই হিন্দুদের পঞ্চানন পশুপতি যোগেন্দ্র শিবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে শিবলিঙ্গের আকারের অনেক পাথরের টুকরাও পাওয়া গেছে। ছোট ছোট যে সব পুতুল পাওয়া গেছে, তার অনেকগুলিই অনেকে কোন গৃহ-দেবতার মূর্তি ব'লে মনে করেন।



মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত পশুবেষ্টিত যোগীমূর্তি

সীলমোহরগুলিতে বটবৃক্ষের পাতা ও গোরুর মূর্তি আছে। তা দেখে মনে হয়, বট-অশ্বত্থ-জাতীয় বৃক্ষ ও গোজাতিকে এরা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করত।

সীলমোহরের যোগীমূর্তি দেখে মনে হয়, এখানকার লোক যোগাভ্যাসও করত।

৬
প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ থেকে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা

যেসব গৃহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোক ছিল। তার কারণ, প্রাসাদোপম বড় বাড়ির সঙ্গে একতলা, দু'তলা, তিনতলা বাড়ি যেমন

আছে, তেমনি আছে কুঠরির মত ছোট ছোট বাড়ির সারি। এগুলিকে দরিদ্র শ্রমিকদের বাসস্থান ব'লে মনে হয়। সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের গহনাও এরূপ শ্রেণী-বিন্যাসের পরিচয় দেয়।

এখানে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো কোন প্রতিপত্তিশালী পুরোহিত শ্রেণী ছিল ব'লে মনে হয় না। তবে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো এখানেও এক ধরনের লিপি ব্যবহৃত হ'ত। সীলমোহরগুলিতে ঐ ধরনের লিপিতে কিসব লেখা আছে। ঐসব লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। ঐসব লিপি দেখে মনে হয়, সমাজে এক শিক্ষিত শ্রেণী ছিলেন, তাঁরা ঐসব লিপির ব্যবহার জানতেন।

শহরগুলির পরিকল্পিত গঠন দেখে বোঝা যায়, এখানে শাসনব্যবস্থা ছিল এবং এই শাসন-ব্যবস্থা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরাই পরিচালনা করতেন। মূল্যবান আলোয়ান গায়ে জড়ানো যে বড় মূর্তিটি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা ঐরূপ কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মূর্তি ব'লেই মনে হয়।

এখানে প্রাপ্ত উন্নত ধরনের শিল্প-সামগ্রী দেখে বোঝা যায়, এখানে দক্ষ শ্রমিক ও শিল্পীর অভাব ছিল না।

এখানে নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত না হ'লে এই ধরনের নগর গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। তাই এখানে যে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের লোক সর্বাধিক ছিল, তাও সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্নাবলী

১। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে কোন্ কোন্ প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে? সেগুলি কোথায় অবস্থিত? সেগুলি এখন থেকে প্রায় কত বৎসর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল? কে কোন্ শহরটি আবিষ্কার করেছিলেন? এইগুলি আবিষ্কারের ফলে কোন্ প্রচলিত ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে?

২। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কতদিন আগে গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়? এরূপ মনে হওয়ার কারণ কি?

৩। মহেঞ্জোদড়োর নগর-পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। মহেঞ্জোদড়োর লোকের খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে কি জান?

৫। মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগারের বর্ণনা দাও।

৬। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীন শিল্প-সামগ্রী সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৭। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্যে কিরূপ উন্নত ছিল?

৮। সিন্ধু উপত্যকার মানুষদের ধর্মীয় ধারণা কিরূপ ছিল?

৯। সিন্ধু অঞ্চলের আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে সেখানকার সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস সম্পর্কে কি ধারণা কর?

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) মহেঞ্জোদড়ো শহরটি — নদের তীরে অবস্থিত। মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ ——। হরপ্পা শহরটি — নদীর তীরে অবস্থিত।

(খ) মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে — ফুট, প্রস্থে — ফুট, এর চারিদিকে — ফুট পুরু একটি প্রাচীর আছে। এর মধ্যস্থলে একটি চৌবাচ্চা আছে। চৌবাচ্চাটি — ফুট লম্বা, — ফুট চওড়া, — ফুট গভীর। এই চৌবাচ্চায় স্নান ও —, দু-ই চলত।

১১। সঠিক উক্তিগুলির নীচে দাগ দাও:

(ক) সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে খুব ধানের চাষ হ'ত। (খ) সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের লোকে গোরুর গাড়ি ব্যবহার করত। (গ) এখানকার লোকে লেখাপড়া জানত না। (ঘ) এখানকার লোকে সম্ভবত যোগাভ্যাস জানত। (ঙ) এখানকার লোকে ঘোড়া ও লোহার ব্যবহার জানত।

১২। ভুল অংশটি কেটে দাও:

(ক) মহেঞ্জোদড়ো সিন্ধু নদের/রাবী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

(খ) হরপ্পা আবিষ্কার করেন রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়/দয়ারাম সাহানি।

(গ) সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে/প্রস্তর যুগে।

॥ ঘ ॥

চীনের প্রাচীন সভ্যতা

হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চল: তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে চীনের হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। হোয়াং-হো নদী উত্তর চীনের পশ্চিমাংশে উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। যে অঞ্চল দিয়ে এই নদী প্রবাহিত, সেই অঞ্চলের মাটির রঙে এই নদীর জল হলদে। তাই এই নদী পীত নদী নামে পরিচিত। পীত নদীর দক্ষিণে ইয়াংসিকিয়াং নদীও পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

এই দুই নদীতে প্রবল বন্যা হওয়ায় এই নদী দুটির তীরবর্তী অঞ্চলও চির-উর্বর। তাই এই অঞ্চলেও কৃষিজীবী মানুষরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং উন্নত ধরনের সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল।

বন্যারোধ সম্পর্কে কিংবদন্তী ঃ এই দুই নদীর তীরবর্তী অঞ্চল অতিশয় উর্বল হ'লেও মেসোপটেমিয়ার মতো এখানেও ছিল বন্যার সমস্যা। নদীর প্রবল বন্যায় কেবল কৃষিক্ষেত্রগুলিই ভেসে যেত না, ভেসে যেত মানুষের বসতি, বন্যায় মরত মানুষ ও গৃহপালিত পশু, দেখা দিত খাদ্যাভাব। তাই এখানকার কৃষিজীবী সমাজকে গোড়া থেকেই বন্যা-নিরোধের জন্য সচেষ্ট হ'তে হয়েছিল।

কিংবদন্তীতে আছে, বন্যারোধের জন্য রাজা কুন নামে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ করলেন। তিনি এই অঞ্চলের চারদিকে বড় বড় বাঁধ বেঁধে ও প্রাচীয় তুলে বন্যার জল আটকে বন্যারোধের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে ফল হ'ল বিপরীত, বাঁধে ও প্রাচীরে জল আটকে পড়ে বন্যার তেজ আরও প্রবল হ'ল। বন্যার জলে দেশ ভেসে গেল।

তখন কুনের পুত্র ইউ বন্যারোধের জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি বন্যার গতি-প্রকৃতি বুঝতেন। তিনি নদীতে বাঁধ দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নদীর তলদেশ গভীর করলেন এবং নানা-নালা কেটে বন্যার জল বেরিয়ে যাবার সুব্যবস্থা করলেন। তাতে বন্যারোধ হ'ল। বন্যার জল খাল-নালায় বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ায় আরও বহু অঞ্চল উর্বর হ'ল। কৃষিক্ষেত্র বাড়ল। দেশে শস্য-সম্পদের অভাব রইল না। বন্যার হাত থেকে মানুষ বাঁচল।

প্রাচীন চীনে সমাজ সভ্যতা ঃ চীনারা ছিল কৃষিজীবী। তারা জোয়ার ও ধানের চাষ করত—চাষ করত নানা রকম সব্‌জি, আর চাষ করত তুঁতে। রেশমকীট পালনের জন্য তুঁত পাতার দরকার। প্রাচীনকালে চীনারাই সম্ভবত প্রথম রেশমের সুতো ও কাপড় বুনত। চীনারা সুতীর কাপড়ও বুনত। সেজন্য তারা তূলোরও চাষ করত।

চীনারা পশুপালনও করত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে শুয়োর ছিল

প্রধান। তারা গোরু-মহিষ, ভেড়া-ছাগলও পুষত। সম্ভবত এই যুগেও তারা ঘোড়ার ব্যবহার জানত।

চীনারা মৃৎশিল্পে খুবই দক্ষ ছিল। মৃৎশিল্পের জন্য চীনের মাটি খুবই উপযোগী ছিল। চীনের উৎকৃষ্ট মাটি থেকেই সম্ভবত চীনামাটি কথাটি এসেছে।

এই অঞ্চলে পাথর দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং ইটের প্রচলন না থাকায় চীনারা প্রধানতঃ মাটি ও গাছের ডালপালা দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করত। গ্রামে থাকত তাদের স্থায়ী বাড়ি। তবে কৃষিক্ষেত্র পাহারা দেওয়ার জন্যও তারা কৃষিক্ষেত্রের জন্য কুঁড়ে তৈরি করত। ঐসব কুঁড়েঘরে পুরুষরা বাস করত। গ্রামের বাড়িতে থাকত স্ত্রীলোকরা। তারা খাবার তৈরি ক'রে মাঠে দিয়ে যেত। চীনা সমাজে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের অবাধ মেলামেশা ছিল না। স্ত্রীরাই ছিল গৃহের কর্ত্রী। তাদের স্বামীরা অনেকটা অতিথির মতোই বাড়িতে আসত।

চীনারা কৃষিজীবী হওয়ায় আকাশ-দেবতা ছিলেন তাদের প্রধান দেবতা। আকাশ-দেবতার পূজোর ভার থাকত দেশের রাজার উপর। তিনিই ছিলেন প্রধান-পুরোহিত। দেবতার উদ্দেশ্যে চীনারা বলি দিত। তারা পূর্বপুরুষদেরও পূজো করত।

দেশের প্রকৃত শাসন-ব্যবস্থা রাজার হাতে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে রাজা দেবতার পূজক ছিলেন। দেশের শাসন চালাত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা।

চীনারাও সুমেরু, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকার মতো লিপির উদ্ভাবন করেছিল। লিপিগুলি ছিল চিত্রাক্ষর অর্থাৎ এক-একটি শব্দের জন্য এক-একটি ছবি ব্যবহৃত হ'ত। ছবিগুলি ক্রমেই সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক হয়ে লিপির রূপ পায়। চীনা অক্ষরগুলি উপর থেকে নীচে লেখা হ'ত। লেখা হ'ত কালিতে হাড় ও বাঁশের পাতলা ছিলার ওপর। এখনকার চীনা অক্ষরের সঙ্গে এই লিপির সাদৃশ্য থাকায়, এগুলির পাঠোদ্ধারে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি।

প্রশ্নাবলী

১। চীনদেশে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কোথায় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ?

২। চীনদেশে বন্যারোধ সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ?

৩। চীনদেশে কিসের চাষ হ'ত ? তুঁত চাষ হ'ত কেন ?

৪। প্রাচীন চীনাদের মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্প সম্পর্কে কি জান ?

৫। প্রাচীন চীনাদের ধর্ম সম্পর্কে কি জান ?

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) প্রাচীনকালে চীনারা জোয়ার ও —— চাষ করত। (খ) রাজাই ছিলেন দেশের প্রধান ——। (গ) চীনাদের প্রধান দেবতা ছিলেন —— দেবতা। তারা পূর্বপুরুষদেরও —— করত। দেবতার কাছে তারা —— দিত। (ঘ) চীনা লিপি ছিল ——। এগুলি কালি দিয়ে —— ও —— ওপর লেখা হ'ত। লেখা হ'ত —— থেকে ——দিকে। এখনকার চীনা লিপির সঙ্গে এই লিপির —— আছে।

———

॥ ঙ ॥

নদীমাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল। ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ অনুসারে এই সভ্যতার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এর মধ্যে কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১

সামাজিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে ভূমি চির-উর্বর হওয়ায় কৃষিজীবী মানুষই এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে বিপদও কম ছিল না—বিশেষত বন্যার বিপদ। তাই নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের বন্যারোধ ও কৃষিক্ষেত্রগুলিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু এই কাজ দু'-একটি পরিবার অথবা অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। এক-একটি উপজাতির মিলিত চেষ্টাতেই বসতি ও কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। ফলে, এখন মানুষ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকার উর্বরতা নষ্ট না হওয়ায়, এখন কৃষিজীবী মানুষকে নূতন কৃষিক্ষেত্রের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হ'ত না। ফলে, তাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে স্থান ও পরিবেশের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল এবং তাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল। পাশাপাশি যেসব উপজাতি বাস করত, তাদের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও স্থায়ীভাবে একত্র বাস করায় এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, তারা ক্রমেই এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল—ক্রমে ক্রমে তাদের ভাষাও এক হয়ে উঠেছিল।

নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অত্যধিক হওয়ায় দেশে উদ্‌বৃত্ত দেখা দিয়েছিল। ফলে, দেশে নানা রূপ শিল্প ও বৃত্তির দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। বিভিন্ন কারণে উদ্‌বৃত্ত দ্রব্য এক শ্রেণীর লোকের হাতে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ায়, সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। সমাজে ক্রমেই ক্ষমতাশালী অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং শাসন-ব্যবস্থাও কঠোর হয়েছিল। দেশে রাজতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল।

২

অর্থনৈতিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য

কৃষিজীবী সমাজে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উদ্‌বৃত্ত হওয়ায়, নানারূপ শ্রমশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। মানুষ এখন পৃথক পৃথক বৃত্তিতে পুরোপুরি নিযুক্ত থাকায়, তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য একটি ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। বিদেশে কৃষিজাত ও শিল্পজাত উদ্বৃত্ত রপ্তানি করার জন্য এবং বিদেশ থেকে দেশে দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানির জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও খুবই উন্নতি হয়েছিল। নদীপথে পণ্যবিনিময় সুবিধা ও নিরাপদ হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিও দ্রুত হয়েছিল। তবে এই যুগে কোথাও মুদ্রার প্রচলন হয়নি। বিনিময়ের মাধ্যমেই সর্বত্র ব্যবসায়-বাণিজ্য হ'ত।

রাজকোষে ও মন্দিরে দেশের উদ্‌বৃত্ত সঞ্চিত হওয়ায়, রাজা ও

পুরোহিতরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। দেশের সমগ্র অর্থনীতি তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন।

প্রশ্নাবলী

১। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের সভ্যতাগুলিতে কি সামাজিক সাধার' বৈশিষ্ট্য ছিল, লিখ।

২। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের সভ্যতাগুলিতে কি অর্থনৈতিক সাধার বৈশিষ্ট্য ছিল, লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগের জন-সমাজ

১

লৌহের আবিষ্কার ও ব্যবহার—লৌহ যুগ

এতদিন মানুষ সোনা, রূপা, টিন, তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত। তারা পাথর এবং তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। তারা যে লোহার কথা একেবারে জানত না, তা নয়। কারণ, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দু-একটি লোহার জিনিস পাওয়া গেছে। ঐসব লোহা সম্ভবত উল্কা-জাত লোহা বা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত লোহা ছিল। ঐ লোহার পরিমাণ এত অল্প ছিল যে, তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেত না।

অথচ লোহা এমন একটি ধাতু, যার পরিমাণ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। এ লোহা আকরিক লোহা। লোহা-পাথর গলিয়ে লোহা উৎপন্ন করতে হয়। কিভাবে লোহা-পাথর গলিয়ে লোহা তৈরি করতে হয়, তা যতোদিন মানুষ জানত না, ততোদিন লোহার ব্যবহারও প্রচলিত হয়নি।

মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা প্রভৃতি স্থানের মানুষ যখন খুবই সভ্য হয়ে উঠেছিল, তখন মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে একদল যাযাবর পশুপালক ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল। এরা ছিল আর্য জাতির লোক। এরা পাহাড়-পর্বতেও ঘুরে

বেড়াত। এদের যেসব দল আর্মেনিয়া ও আনাটোলিয়া (তুরস্ক) প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে এসে বাসা বেঁধেছিল, তারা প্রচুর পরিমাণে আকরিক লোহার সন্ধান পায় এবং লোহা-পাথর গলিয়ে লোহা উৎপন্ন করবার কৌশল আবিষ্কার করে। ঐসব অঞ্চলে লোহা ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে প্রচুর থাকায় লোহার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে। আর্মেনিয়ার দক্ষিণে ও মেসোপটেমিয়ার পশ্চিমে **মিতানি** ও **হিটাইট** জাতির লোক লোহার অস্ত্র ব্যবহার ক'রে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ লোহার অস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রের চেয়ে যেমন ছিল মজবুত, তেমনি ছিল তীক্ষ্ণ।

মিশরের এক ফারাও হিটাইট রাজাকে লোহার অস্ত্র চেয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তা থেকে জানা যায়, অন্যান্য সভ্য লোকেরা ক্রমেই লোহার অস্ত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। লোহার চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে। লোহা-পাথর থেকে লোহা উৎপাদনের এবং লোহাকে গলিয়ে তা দিয়ে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কৌশল অন্যান্য লোকরাও আয়ত্ত করে। লোহা সহজলভ্য এবং সস্তা হওয়ায়, ক্রমেই লোহার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে। লোহা এখন তামা ও ব্রোঞ্জের স্থান নেয়। এইভাবে **লৌহ** যুগের সূচনা হয়। খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে, এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে, **লৌহ যুগ** শুরু হয়েছিল ব'লে অনেকের অনুমান।

২

লৌহ আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া

তামা ও ব্রোঞ্জের তুলনায় লোহা কেবল মজবুত নয়, তা সুলভ ও সহজলোভ্য। তামা ও ব্রোঞ্জের দাম বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করতে পারত না। তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য তাকে রাজা, রাজপরিবার, পুরোহিত শ্রেণী ও অভিজাত শ্রেণীর মুখাপেক্ষী হ'তে হত। লোহা সুলভ ও সহজলভ্য হওয়ায়, এখন তারা নিজের যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই

সংগ্রহ করতে পারল। ফলে, তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেল। লোহার যন্ত্রপাতি তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির চেয়ে বেশি উপযোগী হওয়ায়, কৃষি ও শ্রমশিল্পে দ্রুত উন্নতি ঘটল। লোহা সুলভ হওয়ায়, এখন তা যানবাহনেও ব্যবহৃত হ'তে লাগল। তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র মূল্যবান হওয়ায়, সাধারণ মানুষ তা সংগ্রহ করতে পারত না। লোহার অস্ত্র সুলভ হওয়ায়, এখন সাধারণ মানুষও তা সংগ্রহ করতে পারল।

তামা ও ব্রোঞ্জ মূল্যবান হওয়ায়, সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করতে রাজাদের প্রচুর ব্যয় হ'ত। লোহার অস্ত্র সুলভ হওয়ায় রাজা বিশাল বিশাল সৈন্যবাহিনীকেও লোহার অস্ত্রে সজ্জিত করতে পারলেন। লোহার অস্ত্র মজবুত ও সুতীক্ষ্ণ হওয়ায়, এদের সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি পেল। উন্নত ধরনের যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হওয়ায়, রাজশক্তি বৃদ্ধি পেল। শুধুমাত্র স্বদেশে রাজশক্তিই সুদৃঢ় হ'ল না, অনেক রাজা সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, সাম্রাজ্যও বিস্তার করলেন।

প্রশ্নাবলী

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে মানুষ কি লোহার কথা জানত? যদি জানত, তবে তখন লোহার ব্যবহার ব্যাপক হয়নি কেন? কিভাবে তা ব্যাপক হয়ে উঠল?

২। লৌহ যুগ বলতে কি বোঝ? কিভাবে এই যুগের প্রবর্তন হ'ল? এখন থেকে কতদিন আগে লৌহ যুগ শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়?

৩। লোহার ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায়, সাধারণ মানুষের কি সুবিধা হয়েছিল?

৪। লোহার ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায়, রাজশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল কেন ও কি ভাবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ক ॥

বেবিলন--হামুরাবি

১

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য

বেবিলন : সুমেরের উত্তরে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে বেবিলন অবস্থিত। সেখানে আমোরাইট নামে এক উপজাতি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই উপজাতির রাজা হামুরাবি এক বিশাল রাজ্য গ'ড়ে তোলেন। এখন বেবিলন সুমেরের স্থান অধিকার করে। হামুরাবির অধিকার সারা মেসোপটেমিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষি ও পশুপালন : হামুরাবি সমগ্র সাম্রাজ্যে সেচের ব্যবস্থা করেন এবং একটি বিরাট খাল কাটান। ফলে, মেসোপটেমিয়া পুনরায় শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। আমোরাইট উপজাতি পূর্বে পশুপালক যাযাবর ছিল। হামুরাবি সারা দেশে ছাগল, ভেড়া, গোরু, মহিষ, উট প্রভৃতি পালনের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। পক্ষিপালনেরও ব্যাপক ব্যবস্থা হয়। হামুরাবি দেশে যব ও গমের সঙ্গে নানা শাক-সব্‌জি, পেঁয়াজ, রসুন, এলাচ, জাফরান প্রভৃতি চাষেরও ব্যবস্থা করেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য : কৃষির উন্নতি ঘটায় শ্রমশিল্পেরও উন্নতি ঘটে। দেশে উৎপন্ন কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য দেশের বাইরে বিক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাহির থেকে বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য, পাথর, ধাতু, কাঠ প্রভৃতি শিল্পের নানা উপাদানও আমদানির প্রয়োজন হয়। ফলে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বেশ উন্নতি হয়। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নি। বিনিময়ের মাধ্যমেই ব্যবসায়-বাণিজ্য হ'ত। তবে নির্দিষ্ট আকারের ও ওজনের রৌপ্যপিণ্ড ও স্বর্ণপিণ্ড কতকটা মুদ্রার কাজ করত। যাতে সোনা-রূপা খাঁটি হয়, সেজন্য অনেক সময় স্বর্ণ ও রৌপ্যের পিণ্ডে সরকারী ছাপ দিয়ে দেওয়া হ'ত। গাধা, উট, বলদ প্রভৃতি স্থলপথে মালবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হ'ত। জলযান-গুলি অনেক বড় ও দ্রুতগামী হয়ে উঠেছিল। তবে স্থলপথ নিরাপদ

না হওয়ায়, জলপথেই বেশি ব্যবসায়-বাণিজ্য হ'ত। তাই নৌ-বিদ্যায় ও নৌ-বাণিজ্যে বেবিলন খুব উন্নত ছিল।

মন্দির ও পুরোহিত: সুমেরীয় সমাজের মতো বেবিলনীয় সমাজেও মন্দিরের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা ছিলেন ভূদেবতা এন্‌লিল। কিন্তু বেবিলনীয়দের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেবতা বেল্-মার্দুক। এ ছাড়াও অনেক দেবদেবীও ছিলেন। এঁদের উদ্দেশ্যে বেবিলনীয়রা সুন্দর সুন্দর মন্দির গ'ড়ে তুলত।

মন্দিরের পুরোহিতরা অসামান্য মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাজ-কর মন্দিরেই জমা দেওয়া হ'ত। মন্দিরগুলি সেখানে কতকটা ব্যাংকের মতো কাজও করত। রাজ-কর বস্তুতেই দেওয়া হ'ত। তাই মন্দিরের সঙ্গে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য রাখার জন্য বহু ভাণ্ডার এবং পশুশালা থাকত। ঐগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাব-নিকাশের জন্য বহু কর্মচারী, পরিচারক, পরিচারিকা প্রভৃতি থাকত। মন্দিরগুলি বিদ্যালয়েরও কাজ করত। এখানেই শিশুরা সুমেরীয় লিপি আয়ত্ত করত।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি: মন্দিরগুলিই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পুরোহিতরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নিযুক্ত থাকতেন। বেবিলন জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতে খুবই উন্নত ছিল। মন্দির, প্রাসাদ ও মূর্তিনির্মাণেও বেবিলন বেশ উন্নত ছিল। বেবিলনীয়রা সুমেরীয় লিপিরও অনেক উন্নতি সাধন করেছিল।

হামুরাবির আইন সংহিতা: হামুরাবি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে সুশাসন ও সুবিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সারা রাজ্যে যাতে একই আইন মেনে চলা হয়, সেজন্য তিনি একটি আইনের সংকলন প্রস্তুত করেন। এটিই হামুরাবির আইন-সংহিতা। এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন-গ্রন্থ। হামুরাবি ঐ আইনগুলি পাথরে খোদাই ক'রে সেই পাথরকে বেল্-মার্দুকের মন্দিরের স্তম্ভে ঝুলিয়ে দেন। ঐ পাথরের উপর একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, বেল-মার্দুক স্বহস্তে তাঁকে ঐ আইন সংহিতাটি দিচ্ছেন।

হামুরাবির আইন-সংহিতা চার ভাগে বিভক্ত—নাগরিকবিধি, বিচারবিধি, দণ্ডবিধি ও বাণিজ্যবিধি। নাগরিকবিধিতে তিন প্রকার নাগরিকের উল্লেখ আছে — স্বাধীন নাগরিক, অর্ধ-স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাস। এতে একবিবাহ ও সন্তানের উপর পিতার পূর্ণ প্রভুত্বের কথা বলা আছে। প্রত্যেক জমিদারকে নিজ নিজ জমিদারিতে খাল খনন ও সেচ-ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিচারবিধিতে বিচারক নিয়োগ, সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতির নিয়ম-কানুন আছে। আর দণ্ডবিধিতে অপরাধ অনুসারে নানারূপ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। দণ্ড খুবই কঠোর ছিল। এতে 'চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত' এই নীতিই গৃহীত হয়েছিল। বাণিজ্যবিধিতে জিনিসপত্রের দাম, সুদের হার এবং ব্যবসার নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হয়েছে।



বেল-মার্দুক হামুরাবিকে আইন-সংহিতা দিচ্ছেন

বেবিলনের পতন ঃ হামুরাবির দৃঢ় শাসনব্যবস্থা বেবিলনীয় সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল। পরে তা কাসাইট, হিটাইট প্রভৃতি জাতির আক্রমণে হীনবল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কালডীয় জাতির অধীনে বেবিলন পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কালডীয়দের শাসন-কালে বেবিলন জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরও উন্নত হয়। কালডীয় রাজারা প্রাসাদে, মন্দিরে, উদ্যানে বেবিলনকে সুসজ্জিত করেন। কালডীয় রাজা নেবুকাডনেজার তাঁর প্রাসাদের শীর্ষে যে বিশাল ও বিস্ময়কর উদ্যান রচনা করেন, তা 'বেবিলনের শূন্যোদ্যান' নামে পরিচিত।

প্রশ্নাবলী

১। বেবিলন কোথায় অবস্থিত? কোন্ উপজাতি এখানে বাস করত? ঐ উপজাতির কোন্ রাজা সারা মেসোপটেমিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেন?

২। হামুরাবির শাসনকালে মেসোপটেমিয়ায় কৃষি ও পশুপালনের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?

৩। বেবিলনীয়রা ব্যবসায়-বাণিজ্যে কেন উন্নত হয়েছিল? তারা কি রপ্তানি করত ও কি আমদানি করত? তখন কি মুদ্রার প্রচলন ছিল? কিসের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলত? পরিবহণের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল?

৪। বেবিলনীয়দের প্রধান দেবতা কে ছিলেন? বেবিলনীয়দের জীবনে মন্দিরের গুরুত্ব কিরূপ ছিল?

৫। বেবিলনীয় সমাজে পুরোহিতরা অসামান্য সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কেন?

৬। 'আইন-সংহিতা' বলতে কি বোঝায়? পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন-সংহিতা কোন্‌টি? ঐ আইন-সংহিতা কয় ভাগে বিভক্ত? ভাগগুলির নাম কি?

৭। হামুরাবির আইন-সংহিতা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৮। বেবিলনের শূন্যোদ্যান কি? তা কে নির্মাণ করেছিলেন? তিনি কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন?

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর:

— নদীর তীরে সুমেরের — বেবিলন অবস্থিত ছিল। — উপজাতির লোকরা এখানে বাস করত। ঐ উপজাতির রাজা — সমগ্র মেসোপটেমিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি যে আইন-সংকলন করেছিলেন তার নাম — —। তিনি এটিকে খোদাই ক'রে — মন্দিরের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। হামুরাবির আইন-সংহিতা — ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলি হ'ল —, —, — ও —।

॥ খ ॥

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশর

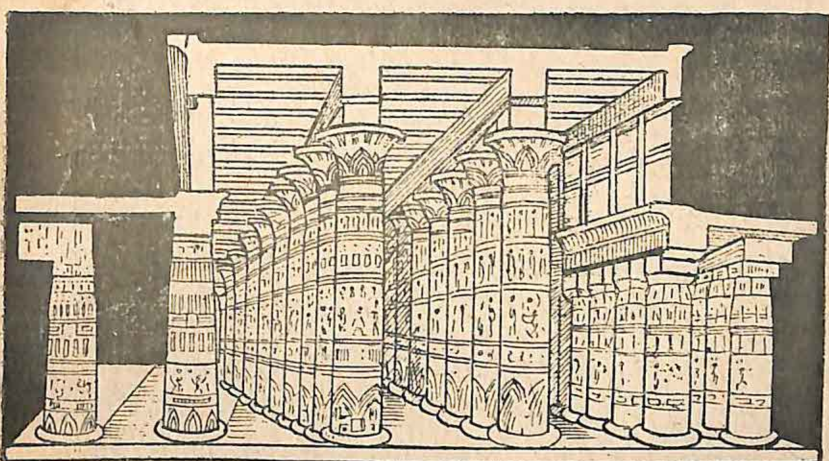
১

মিশরের সাম্রাজ্যবিস্তার—উপনিবেশসমূহ

হিক্‌সস্ আক্রমণ: এখন থেকে সাড়ে তিন হাজার বছরেরও আগে এক পশুপালক যাযাবর জাতির লোক উত্তর দিক থেকে ক্রমে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মিশরে প্রবেশ করে। লোহার অস্ত্রের এবং অশ্বের ব্যবহার তারা জানত এবং তারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিল। তারা

মিশরীয়দের পরাজিত ক'রে মিশরে রাজত্ব করতে থাকে। মিশরীয়রা তাদের বলত **হিক্‌সস্** বা মেষপালক রাজা।

তৃতীয় থুতমিসঃ হিক্‌সসরা মিশরে প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করেছিল। মিশরীয়রা তাদের কাছ থেকে লৌহাস্ত্র ও ঘোড়ার ব্যবহার শিখে নিয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যিনি মিশরে অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর নেতৃত্বে মিশরীয়রা হিক্‌সস্‌দের পরাজিত ক'রে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। অষ্টাদশ রাজবংশের রাজা মিশরকে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান করে তোলেন। এই বংশের ফারাও **তৃতীয় থুতমিস** এক দুর্জয় সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে



কারনাকের মন্দির

তোলেন। তাঁর কীর্তি-কাহিনী কারনাকের বিখ্যাত মন্দিরে খোদিত আছে। তিনি নিউবিয়া (ইথিওপিয়া), সুদান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া, সাইপ্রাস, ক্রীট প্রভৃতি রাজ্য জয় ক'রে এক বিশাল মিশরীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

তৃতীয় থুতমিসকে **মিশরের নেপোলিয়ন** বলা হয়।

মিশরীয় উপনিবেশসমূহঃ বিজিত অঞ্চলগুলি মিশরের উপনিবেশে পরিণত হয়। ঐসব উপনিবেশের শাসনের জন্য তিনি বিশ্বস্ত

শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শাসনকর্তাদের পুত্রদের মিশরে রেখে মিশরীয় আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সুশিক্ষিত ক'রে তোলা হয়। এতে তারা মনে প্রাণে মিশরীয় হয়ে ওঠে। শাসন-কর্তার মৃত্যু হ'লে মৃত পিতার স্থলে পুত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হ'ত। উপনিবেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থায়ীভাবে সৈন্যবাহিনী রাখা হ'ত। উপনিবেশগুলি থেকে নিয়মিত রাজ-কর আদায় হতে থাকে। ঐসব উপনিবেশে মিশরীয় সভ্যতা, ধর্ম, দেবদেবী ও লিপি-প্রবর্তিত হয়। মিশরীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ঐসব স্থানের অধিবাসীদের সভ্যতার পথে এগিয়ে দেয়।

২

মিশরীয় পুরোহিতদের ক্ষমতা

মিশরীয় সম্রাটরা খুবই প্রতাপশালী হ'লেও এবং জনসাধারণ তাঁদের দেবতা ব'লে গণ্য করলেও সমাজে পুরোহিতদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সমাজে মর্যাদায় ও ক্ষমতায় ফারাওদের পরেই ছিল তাঁদের স্থান। তাঁদের মধ্য দিয়েই দেবদেবীর অভিলাষ ব্যক্ত হ'ত। তাঁরাই দেবদেবীকে প্রসন্ন রাখতে পারতেন। তাই ফারাওরাও তাঁদের শরণাপন্ন হতেন এবং দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করতে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। সাধারণ মানুষ নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা জানাতে এবং দেবতার প্রসন্ন আদায় করতে তাঁদের কাছেই ছুটতো। তাঁরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন। তাঁদের মুখের কথা ছিল মানুষের কাছে দৈববাণী। তাঁরাই ছিলেন সমাজের জ্ঞানী, গুণী মানুষ। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, লিপি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা সুপণ্ডিত ছিলেন। এগুলি জনসাধারণের কাছে ছিল বিস্ময়ের বস্তু।

প্রশ্নাবলী

১। কাদের 'মেষপালক রাজা' বলা হ'ত? এরা কেন দুর্ধর্ষ ও দুর্জয় ছিল? এরা কতদিন মিশরে রাজত্ব করেছিল? এরা কিভাবে মিশর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল?

২। কোন্ রাজবংশ মিশর থেকে হিক্‌সস্‌দের বিতাড়িত করেছিল? এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তাঁকে কি বলা হয়? কেন বলা হয়?

৩। মিশরীয় সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি জান ?

৪। মিশরীয় পুরোহিতদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ কি ? তাঁদের প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল ?

৫। বাক্যাংশগুলি ঠিকভাবে সাজাও ঃ

মিশর-বিজয়ী পশুপালকদের	মিশরের নেপলিয়ন বলা হ'ত।
মিশরের পুরোহিতরা	মেষপালক রাজা।
ফারাও তৃতীয় থুতমিসকে	মিশরকে শক্তিশালী ক'রে তোলে।
হিক্‌সস্ শব্দের অর্থ	ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন।
অষ্টাদশ রাজবংশ	'হিক্‌সস্' বলা হ'ত।

॥ গ ॥

পারস্যদেশ

১

পারস্যের অভ্যুত্থান

মিডি ও পারসিক ঃ মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপ থেকে একটি যাযাবর জাতি ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল। যারা মেসোপটেমিয়া ও মিশরে সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল, এরা ছিল তাদের থেকে স্বতন্ত্র। এরা ছিল গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায় ; এদের নাসা টিকল ও উঁচু। এরাই **আর্য** নামে পরিচিত। এরা লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানত। এদের কয়েকটি দল মেসোপটেমিয়ার পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে বসতি স্থাপন করে। যারা মেসোপটেমিয়ার পূর্বে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা **মিডি** এবং যারা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে পারস্যোপসাগরের তীরে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা **ইরানী** বা **পারসিক** নামে পরিচিত।

মিডি ও পারসিক উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মও ছিল এক। তবে গোড়ার দিকে মিডিরাই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তারা আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই রাজ্যের নাম **মিডিয়া**। তারা উত্তরে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তার করে। দক্ষিণে পারসিকদের বাসস্থানও তাদের অধিকারে যায়।

সাইরাসঃ খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসিকদের দলপতি সাইরাস মিডিরাজকে পরাজিত ক'রে মিডি সাম্রাজ্য অধিকার করেন। এশিয়া মাইনরের লিডিয়া রাজ্যটি ঐ সময়ে ধনসম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। লিডিয়াই সর্বপ্রথম মুদ্রার প্রচলন করেছিল বলে বলা হয়। সাইরাস লিডিয়াও জয় করেন। এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্যগুলিও তাঁর পদানত হয়। তিনি উত্তরে আফগানিস্থান পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি ভারতবর্ষও আক্রমণ করেছিলেন। তবে তাঁর এই আক্রমণ সফল হয় নি। এভাবে এক বিশাল পারসিক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

দরায়ুসঃ সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **কাম্‌বিসিস** সম্রাট হন। তিনি মিশর জয় করেন। কিন্তু পরে তিনি হঠাৎ নিহত হন। তখন পারস্যের সম্রাট হন তাঁর এক জ্ঞাতি এবং সাইরাসের মন্ত্রিপুত্র **দরায়ুস**। দরায়ুস ভারত আক্রমণ করেন এবং ভারতের সিন্ধু ও গান্ধার অঞ্চল অধিকার করেন। এই অঞ্চল থেকে নাকি পারস্য সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ আদায় হ'ত।

দরায়ুস সারা সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি সারা সাম্রাজ্যকে কুড়িটি প্রদেশে ভাগ করেন এবং প্রদেশগুলির জন্য শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শাসনকর্তারা **সত্রপ** নামে পরিচিত ছিলেন।

পারসিকরা মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে এই বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল। **সুসা** ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী। সাম্রাজ্যে পার্সেপলিস, পাসারগাডে, সার্ডিস প্রভৃতি আরও অনেক বড় বড় শহর ছিল। এই সব শহর বড় বড় রাজপথের দ্বারা যুক্ত ছিল। পারস্য-সম্রাটরা দেশে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা ডাক-ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেছিলেন। সারা সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা সহজ ও নিরাপদ হওয়ায় দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল, নৌশক্তিতেও পারসিকরা দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। তাদের নৌবহর পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিত।

দরায়ুসের শাসনকালে এশিয়া মাইনরের গ্রীকরাজ্যগুলি বিদ্রোহ করলে, দরায়ুস এই সব বিদ্রোহ দমন করেন। গ্রীক রাজ্যগুলির

বিদ্রোহে গ্রীক নগর-রাষ্ট্র **আথেন্স** সাহায্য দিয়েছিল। সেজন্য দরায়ুস আথেন্সের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং আথেন্সকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আথেন্স আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হয়। দরায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জেরেক্সিস পারস্যের সম্রাট হন।

পারসিকদের ধর্ম ও জরথুস্ত্র

মিডি ও পারসিকদের ধর্ম ছিল একই। এই ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন **জরোয়েস্টার** বা **জরথুস্ত্র**। জরথুস্ত্রের মতে পৃথিবীতে নিরন্তর দুই শক্তির মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে। এই দুই শক্তি হ'লো—শুভ ও আলোকের শক্তি এবং অশুভ ও অন্ধকারের শক্তি। শুভ ও আলোকের শক্তির দেবতা হলেন **মাজ্‌দা** বা **আহুরমাজ্‌দা**। অশুভ ও অন্ধকারের অপদেবতা হ'লো **আহ্‌রিমন**। জরথুস্ত্র মানুষকে সর্বদা শুভ ও আলোকের শক্তির পক্ষে এবং অশুভ ও অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে থাকতে বলেন। আলোকের শক্তির উৎস অগ্নি। তাই জরথুস্ত্রের ধর্মে গৃহে গৃহে, মন্দিরে মন্দিরে সর্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হ'ত। পারসিকরা ছিল প্রকৃতপক্ষে অগ্নির উপাসক।

জরথুস্ত্রের বাণী একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের নাম **আবেস্তা** বা **জেন্দাবেস্তা**। এটি পারসিকদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। পারসিকরা আর্য ছিল। তাই পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাব ও ভাষার সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদের ভাব ও ভাষার মিল আছে।

জরথুস্ত্রের ধর্ম প্রায় দেড় হাজার বছর পারস্যে প্রচলিত ছিল। পরে পারস্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হ'লে পারসিকদের অনেকে নিজ নিজ ধর্মরক্ষার জন্য ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। ঐসব পারসিকরাই এখন ভারতে **পার্শী** নামে পরিচিত।

প্রশ্নাবলী

১। মিডি ও পারসিকরা কোন্ জাতির লোক ছিল। ঐ জাতির লোকে প্রথমে কোথায় বাস করত? তারা কোন্ দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিল? তারা কোথায় বসতি স্থাপন করেছিল?

২। মিডিরা কিভাবে রাজ্য স্থাপন করেছিল? ঐ রাজ্যের নাম কি? ঐ রাজ্য কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল? পারসিকদের সঙ্গে মিডিদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৩। পারস্য সাম্রাজ্য কে স্থাপন করেছিলেন? তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন সম্পর্কে কি জান? মিশর জয় করেছিলেন কোন্ পারস্য সম্রাট?

৪। দরায়ুস কে ছিলেন? তিনি কিভাবে সম্রাট হন? তিনি কোন্ ভারতীয় অঞ্চল জয় করেন? ঐ অঞ্চল থেকে পারস্য সাম্রাজ্যের কি পরিমাণ রাজস্ব আসত?

৫। পারস্য-সম্রাটরা সাম্রাজ্যের সুশাসন ও উন্নতির জন্য কি করেছিলেন? পারস্য-সাম্রাজ্যের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল?

৬। পারসিকদের ধর্ম কে প্রচার করেছিলেন? ঐ ধর্মের মূল কথা কি?

৭। নিচের উক্তিগুলির সঠিক অংশের তলায় দাগ দাও:

(ক) পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন দরায়ুস/সাইরাস/কাম্বিসিস।

(খ) মিশর জয় করেছিলেন পারস্য-সম্রাট দরায়ুস/সাইরাস/কাম্বিসিস।

(গ) সিন্ধু ও গান্ধার অঞ্চল জয় করেছিলেন দরায়ুস/কামবিসিস/সাইরাস।

(ঘ) পারসিকদের ধর্ম প্রবর্তন করেন হামুরাবি/জরথুস্ত্র/সাইরাস।

(ঙ) পারসিক ধর্মে শুভ ও আলোকের দেবতা হলেন আহ্রিমন/আবেস্তা/মাজ্দা।

———

॥ ঘ ॥

ইহুদী জাতি

১

ইহুদীদের মিশরে বন্দিদশা ও বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ

ইহুদী জাতি : যে উর্বর সংকীর্ণ ভূখণ্ড এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে যুক্ত করেছে, তার দক্ষিণ অংশের নাম প্যালেস্টাইন। এখানে একসময় **ফিলিস্টাইন** জাতির লোকরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ব'লেই সম্ভবত এই নাম। অনাবৃষ্টি ও জলাভাবের ফলে পার্শ্ববর্তী মরু অঞ্চলের লোকরা প্রায়ই এখানে এসে পৌঁছত। ইহুদীরা মূলত ছিল আরবদেশের লোক। আরবরা যে-আব্রাহামকে তাদের আদিপুরুষ মনে করে, ইহুদীরাও সেই আব্রাহামকেই তাদের আদিপুরুষ মনে করে। পশুপালনই ছিল এদের প্রধান জীবিকা। এরা ছিল যাযাবর। তাই এরা বেবিলনিয়া ও প্যালেস্টাইনে এসে তৃণভূমির সন্ধানে হানা দিত ও বসবাস করত।

মিশরে বন্দিদশা : এরা সম্ভবত হিক্সস্দের মিশর আক্রমণকালে মিশরে গিয়েছিল। ইহুদীরা ছিল হিক্সস্দের মতোই পশু-

পালক ও যাযাবর। তাই তারা হিক্‌সস্‌দের প্রিয় হয়ে ওঠে এবং মিশরে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে।

মিশরীয়রা হিক্‌সস্‌দের যেমন ঘৃণা করত, ইহুদীদেরও তেমনি ঘৃণা করত। তারা হিক্‌সস্ শাসকদের বিতাড়িত ক'রে যখন স্বাধীন হ'লো, তখন তারা ইহুদীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন শুরু করল। শেষে ইহুদীরা মিশরীয়দের ক্রীতদাসে পরিণত হ'লো। মিশরে ইহুদীদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছলো।

এই সময়ে ইহুদীদের মধ্যে **মোজেস** বা **মুশা** নামে এক শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়। আব্রাহামের উপাস্য দেবতা ছিলেন **জিহোভা**। ইহুদীরা জিহোভাকেই তাদের দেবতা মনে করতো। মোজেস ইহুদীদের বললেন, জিহোভার করুণায় ইহুদী জাতির মুক্তি আসন্ন; ইহুদী তাদের বাসভূমিরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মোজেসের আহ্বানে ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধ হ'লো এবং মোজেসের নেতৃত্বে তারা মিশরের বাইরে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মিশর থেকে ইহুদীরা যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল। ইহুদীদের মিশর থেকে পলায়ন-সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, ইহুদীদের নিয়ে মোজেস লোহিত সাগরের তীরে এসে পৌঁছলেন। ফারাওয়ের সৈন্যবাহিনী তাঁদের ধরবার জন্য পিছু পিছু তাড়া ক'রে এসেছিল। মোজেস তাঁর জাদুদণ্ড দুলিয়ে লোহিত



মোজেস

সাগরের জলকে দুদিকে সরে যেতে আদেশ করলেন। জিহোভার কৃপায় লোহিত সাগরের জলরাশি দুদিকে সরে গেল এবং মাঝখান দিয়ে একটি প্রশস্ত পথ বার হ'লো। সেই পথ দিয়ে মোজেস ইহুদীদের নিয়ে লোহিত সাগরের অপর পারে গেলেন। ঐ পথে ফারাওয়ের সৈন্যবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ছুটে এলো। তারা যখন সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে পৌঁছলো, তখন লোহিত সাগরের জলরাশি প্রবল বেগে নেমে এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বন্দিদশা থেকে মুক্ত ক'রে মোজেস ইহুদীদের মিশরের বাইরে আনলেন।

মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে ফিরে এল। প্যালেস্টাইনে এসে মোজেস জেরুসালেম নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু ইহুদীদের এখানেও অনেক শত্রুর সম্মুখীন হতে হ'লো। এদের মধ্যে প্রধান ছিল ফিলিস্টাইনরা। শেষ পর্যন্ত ইহুদীরা তাদের রাজা **সল, ডেভিড, সলোমন** প্রভৃতির নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

২

ইহুদীদের ধর্ম

মোজেস কেবল ইহুদীদের মিশরে বন্দিদশা থেকে মুক্তই করেননি, তিনি ইহুদীদের মধ্যে জিহোভার বাণীও প্রচার করেন। তিনি বলেন, জিহোভাই ইহুদীদের একমাত্র ঈশ্বর। তিনি ইহুদীদের পরিত্রাতা এবং ইহুদীদের প্রতি অত্যাচারীদের কঠোর দণ্ডদাতা। তিনি এক ও নিরাকার।

কথিত আছে, জিহোভার নির্দেশে মোজেস একদিন ঝড়বৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের মধ্যে অতি উচ্চ এক পাহাড়ে আরোহণ করেন। সেখানে তিনি অগ্নি-অক্ষরে ক্ষোদিত দুটি প্রস্তরফলক পান। ঐ দুটি প্রস্তরফলকে জিহোভার দশটি আদেশ লিপিবদ্ধ ছিল। আদেশগুলি হ'লো ঃ

(১) পিতামাতাকে ভক্তি ক'রো ; (২) হত্যা ক'রো না ; (৩) চরিত্রহীন হ'য়ো না ; (৪) চুরি ক'রো না ; (৫) মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না ; (৬) প্রতিবেশীর কিছুতে লোভ ক'রো না ; (৭) মূর্তিপূজা ক'রো না ; (৮) ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় ; (৯) অকারণে ঈশ্বরের

নামে শপথ ক'রো না এবং (১০) পবিত্র কাজের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট রেখো।

ইহুদীদের ধর্মকথা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্টে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রশ্নাবলী

১। হিক্‌সস্‌রা ইহুদীদের আনুকূল্য করত কেন? হিক্‌সস্‌দের বিতাড়নের পর মিশরে ইহুদীদের কি অবস্থা হয়েছিল? কেন ঐ অবস্থাকে বন্দিদশা বলা হয়েছে?

২। মিশরে বন্দিদশা থেকে কে ইহুদীদের মুক্ত করেছিলেন? তিনি কিভাবে মুক্ত করেছিলেন?

৩। মিশর থেকে ইহুদীদের পলায়ন সম্পর্কে কি কাহিনী প্রচলিত আছে?

৪। ইহুদীদের ধর্ম সম্পর্কে কি জান?

৫। জিহোভার দশটি আদেশ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। নির্ভুল অংশের নিচে দাগ দাও:

(ক) মিশর থেকে ইহুদীদের মুক্ত করেছিলেন আব্রাহাম/মোজেস/সলোমন।

(খ) ইহুদীদের দেবতার নাম জিউস/জোভ/জিহোভা।

(গ) ইহুদীদের ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে আবেস্তায়/বাইবেলে/কোরাণে।

সপ্তম অধ্যায়

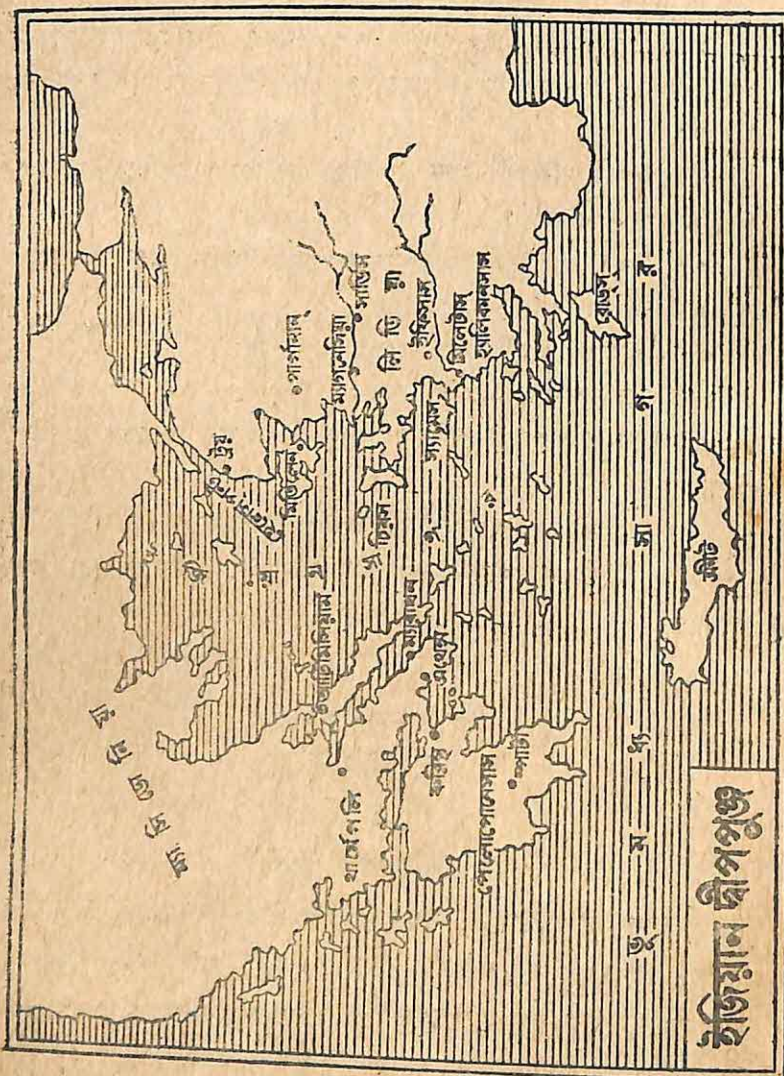
প্রাচীন গ্রীস

১

গ্রীস ও ক্রীটান সভ্যতা

গ্রীসদেশ: এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে ঈজিয়ান সাগর। ঈজিয়ান সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত উপদ্বীপই গ্রীসের মূল ভূখণ্ড। এই উপদ্বীপের দক্ষিণাংশের নাম **পেলোপনেসাস**। পেলোপনেসাস উত্তর ও মধ্য গ্রীস থেকে সমুদ্রের দ্বারা প্রায় বিচ্ছিন্ন। কেবলমাত্র, পূর্বাংশে করিন্থ যোজকের দ্বারা যুক্ত। গ্রীসদেশ অসংখ্য পাহাড়ে ও সমুদ্রের খাঁড়িতে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন; এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হ'লে দুর্গম গিরিপথ ও সমুদ্রই ভরসা।

মিডি ও পারসিকদের মতোই আর্য জাতির একটি শাখা উত্তর থেকে ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হ'য়ে গ্রীসের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। এই শাখার বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন সময়ে এসেছিল। এইসব



উপজাতি আকিয়ান, ডোরিয়ান, আইওনিয়ান, ইওলিয়ান প্রভৃতি নামে পরিচিত। এরা সকলেই নিজেদের হেলেনিজ বলত এবং একই গ্রীক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক্রীটান সভ্যতাঃ ঈজিয়ান সমুদ্রের মুখে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। তার নাম **ক্রীট**। গ্রীকরা গ্রীসদেশে প্রবেশ করার আগেই ক্রীটের অধিবাসীরা সভ্যতায় উন্নত হ'য়ে উঠেছিল। চারিদিক সমুদ্র-বেষ্টিত হওয়ায় এখানকার লোকরা নৌবিদ্যায় ও নৌবাণিজ্যে সুনিপুণ হ'য়ে উঠেছিল। এরা শ্রমশিল্পেও খুবই উন্নত ছিল। উন্নত শ্রমশিল্প ও নৌবাণিজ্যের ফলে ক্রীট ছিল অতিশয় সমৃদ্ধ। ক্রীটের রাজধানী নোসস-এর ধনসম্পদ ও রাজপ্রাসাদ রূপকথার বিষয়বস্তু ছিল।

ক্রীটের সভ্যতা সহজেই গ্রীসের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। কোন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে শেষ পর্যন্ত নোসস বিধ্বস্ত হয়। গ্রীকরা ছিল পশুপালক। তারা গ্রীসে বসতি স্থাপন করার পর কিছু কিছু কৃষি ও শ্রমশিল্প আয়ত্ত করেছিল। ক্রীটানদের সংস্পর্শে এসে তারা ক্রমেই সভ্য হয় এবং ক্রীটানদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ক্রীটান সভ্যতা বিধ্বস্ত হওয়ার পর এই অঞ্চলে গ্রীকরা প্রভুত্ব বিস্তার করে।

২

হোমার-বর্ণিত গ্রীস—হোমারীয় যুগ

হোমার-রচিত মহাকাব্য দুটি থেকে আমরা প্রাচীন গ্রীকদের সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। গ্রীসের সঙ্গে ট্রয়ের যুদ্ধ ও গ্রীক যোদ্ধাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিয়ে এই মহাকাব্য দুটি রচিত। এই মহাকাব্য দুটির নাম **ইলিয়াড** ও **ওডিসি**। এই দুটি মহাকাব্য থেকে গ্রীসের যে যুগের কথা জানা যায়, তাকে হোমারীয় যুগ বলা হয়।

গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধঃ গ্রীসের দক্ষিণাংশে পেলোপনেসাসের উত্তর-পূর্ব কোণে **মাইসেনি** নামে একটি গ্রীক রাজ্য ছিল। মাইসেনি রাজ্য ছিল গ্রীক রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সব গ্রীক রাজ্য মাইসেনির প্রাধান্য মেনে চলত।

এই সময়ে ঈজিয়ান সমুদ্রের অপর পারে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোণে **ট্রয়** নামে একটি রাজ্য ছিল। ট্রয় নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। তার ধনসম্পদ গ্রীকদের ঈর্ষার বস্তু ছিল। ট্রয়ের মতো

সুরক্ষিত নগরী সেকালে আর ছিল না। এর চতুর্দিকে ছিল পনের ফুট উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের উপরিভাগ ছিল রাজপথের মতো প্রশস্ত।

গ্রীস ও ট্রয়ের মধ্যে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শেষ পর্যন্ত পারিবারিক এক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে এদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ট্রয়ের রাজা **প্রায়ামের** পুত্র **প্যারিস** মাইসেনির রাজা **আগামেম্‌ননের** ভাই স্পার্টা-র রাজা **মেনেলসের** গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। মেনেলসের সুন্দরী পত্নী **হেলেনকে** তিনি অপহরণ ক'রে নিয়ে যান। এই অপমানে গ্রীকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজা আগামেম্‌ননের নেতৃত্বে ট্রয় আক্রমণ করে। কিন্তু ট্রয়-নগরী ধ্বংস করা সহজ ছিল না। দশ বৎসর ধরে যুদ্ধ চলে। শেষে গ্রীকরা যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে ফিরে যাওয়ার ভান করে এবং ট্রয় নগরীর বাইরে একটি বিশাল কাঠের ঘোড়া রেখে যায়। ঐ ঘোড়ার মধ্যে গ্রীক-সেনারা লুকিয়েছিল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ট্রয়বাসীরা ঘোড়াটিকে নগরের মধ্যে আনে। রাত্রিতে গ্রীক-সেনারা ঘোড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে ট্রয় নগরীর তোরণ খুলে দেয়। তখন অগণিত গ্রীক-সেনা জাহাজ থেকে নেমে ট্রয় নগরে প্রবেশ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়।



জিউস

ট্রয়-বিজয়কে গ্রীকরা জাতির এক সমুজ্জ্বল কীর্তি মনে করে। এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ট্রয় নগরী ধ্বংস হয়েছিল। ট্রয় ধ্বংসের প্রায় তিন'শ বছর পরে গ্রীক মহাকবি **হোমার** তাঁর **ইলিয়াড ও ওডিসি** মহাকাব্য দুটি রচনা করেছিলেন।

হোমারের মহাকাব্য থেকে জানা যায়, গ্রীকরা কৃষি, পশু-পালন, শ্রমশিল্প, নৌবাণিজ্য ও যুদ্ধে খুবই পারদর্শী ছিল। রাজারাও সাধারণ প্রজার মতো জীবন যাপন করতেন। রানীকেও স্বহস্তে গৃহকর্ম করতে হ'তো। রাজাদের অনেকেই দৈবী শক্তিতে বলীয়ান

ছিলেন। তাঁদের গৃহগুলির গঠন সাধারণ হ'লেও তা সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জে পূর্ণ থাকত। রাজ-প্রাসাদের মধ্যেও ভেড়ার পাল ঘুরে বেড়াত। গ্রীকরা শিকার করতে খুব ভালোবাসত। তারা ছিল ভোজন-বিলাসী এবং তারা প্রচুর পরিমাণে রুটি, মাংস ও মদ খেতো।


গ্রীক দেবী আথেনা

সর্বদা রাজপ্রাসাদে উৎসব ও ভোজ লেগেই থাকত, কবিরা উৎসবে ও ভোজে গান শোনাতেন, সকলেই পানাহারে মত্ত থাকতো। তাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল বল্লম; তারা শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরত এবং ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে তৈরী ঢাল ব্যবহার করত। বীর যোদ্ধারা রথে চ'ড়ে যুদ্ধ করতেন। তাঁদের মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধও হ'তো।

গ্রীকরা বহু দেবদেবীর পূজা করতো। গ্রীকরা বিশ্বাস করত, দেব-দেবীরা উত্তর গ্রীসে **অলিম্পাস** পর্বতের চূড়ায় থাকেন। তাঁরা মানুষের মতোই দেহধারী, মানুষের মতোই ঈর্ষা ও ক্রোধের বশবর্তী। তাঁরা প্রার্থনায় তুষ্ট হন, হেলায় ক্রুদ্ধ হন। দেবতাদের রাজা হলেন **জিউস**। তিনি সর্বশক্তিমান্। তাঁর সামান্য ভ্রূকুটিতেই বিশ্ব-সংসার কম্পিত হয়। তিনি ঝড় ও বজ্রের দেবতা। **পসিডন** হলেন সমুদ্রের দেবতা; **আরিস** যুদ্ধের দেবতা; **অ্যাপলো** সংগীত ও চিকিৎসার দেবতা; **আথেনা** কলাশিল্পের দেবী। এ ছাড়াও গ্রীকদের আরো বহু দেবদেবী ছিলেন। গ্রীকরা দেবতার উদ্দেশ্যে বৃষ ও মেষ বলি দিত।


অ্যাপলো

৩
গ্রীক নগর-রাষ্ট্র

গ্রীকরা নিজেদের একজাতি ব'লে মনে করলেও, গ্রীসের ভূখণ্ড সমুদ্র-পর্বতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তা গ্রীকজাতির ঐক্যের পথে অন্তরায় ছিল। তাই গ্রীক উপজাতিগুলি এক-একটি পর্বত ও পর্বতের পার্শ্ববর্তী উর্বরভূমি নিয়ে নিজ-নিজ জনপদ গড়ে তুলত এবং এগুলিই এক-একটি নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হ'তো। পর্বতের উচ্চতম অংশটিই হ'ত নগর-রাষ্ট্রের কেন্দ্র, রাজধানী ও দুর্গ। এটিকে বলা হ'ত **অ্যাক্রোপলিস**।

নগর-রাষ্ট্রগুলি ছোট হওয়ায় নাগরিকরা রাষ্ট্রের পরিচালনায় অংশ নিতে পারত। নগর-রাষ্ট্রগুলি যেমন ছোট ছিল, তেমনি নাগরিকদের সংখ্যাও ছিল কম। ক্রীতদাস ও স্ত্রীলোকদের নাগরিক অধিকার ছিল না।

গোড়ার দিকে রাজাই দেশ শাসন করতেন। কিন্তু রাজারা ক্রমেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন এবং নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকরাই হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রের শাসক। এইভাবে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলিতে ক্রমে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'লেও ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিরা অনেক সময় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার করতেন। অনেক সময় তাঁরা জনসাধারণের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে নিজের ইচ্ছামত রাষ্ট্রশাসন করতেন। তাঁদের বলা হ'ত **টাইরেণ্ট**। অনেক সময় তাঁরা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলেও গ্রীসদেশে ভালো টাইরেণ্টেরও অভাব ছিল না। তাঁরা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করতেন।

দেশে বহু নগর-রাষ্ট্র থাকলেও মধ্য-গ্রীসের **আথেন্স** এবং দক্ষিণ গ্রীসের **স্পার্টা**-ই ছিল সর্বপ্রধান।

৪
গ্রীক উপনিবেশসমূহ

দেশে ক্রমেই জনসংখ্যা বাড়ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রে বাসযোগ্য বা কৃষিযোগ্য জমি বাড়াবার কোনও উপায় ছিল না। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির

এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক নগর-রাষ্ট্র গ্রীসের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল।

উপনিবেশ স্থাপনের জন্য দেশের বাইরে, সাধারণত সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বা কোনও দ্বীপে একটি স্থান নির্বাচন করা হ'ত। তারপর কোন জনপ্রিয় নেতার অধানে একদল স্ত্রী-পুরুষকে জাহাজে ক'রে নির্বাচিত স্থানে পাঠিয়ে দিত। তারা সেই স্থানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করত। উপনিবেশগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন থাকত, কিন্তু মাতৃ-রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বজায় রাখত। এইসব উপনিবেশের সঙ্গে মাতৃ-রাষ্ট্রগুলির ব্যবসায়-বাণিজ্যও চলতো।

গ্রীকরা এইভাবে ঈজিয়ান সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে, ভূমধ্যসাগরের তীরে, কৃষ্ণসাগরের তীরে, সাইপ্রাস, সিসিলি, কর্সিকা, সার্দিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গ্রীসের বাইরে অসংখ্য গ্রীক উপনিবেশ গড়ে ওঠায় গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইসব উপনিবেশে বহু বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের জন্ম হয়েছিল এবং গ্রীক উপনিবেশগুলি গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছিল।

৫
আথেন্স বনাম স্পার্টা

আথেন্স ও স্পার্টা ছিল গ্রীসের দুটি প্রধান রাষ্ট্র। কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও আদর্শ প্রায় বিপরীত ছিল। ফলে এদের মধ্যে ছিল চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ। এদের এই অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত গ্রীসের পতনের কারণ হ'য়েছিল।

আথেন্স: আথেন্স নগর-রাষ্ট্রটি মধ্য গ্রীসে এটিকায় অবস্থিত ছিল। গ্রীসের প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল আথেন্স। সংগীত, নাটক, কাব্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান—এর সবই এখানে বিস্ময়করভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। আথেন্স নগরী দেবদেবীর মূর্তিতে ও মন্দিরে পূর্ণ ছিল। এখানে

ক্রীতদাস-প্রথা থাকলেও স্বাধীন কৃষক ও শ্রমিকের অভাব ছিল না। গণতন্ত্রই ছিল এখানকার শাসন-ব্যবস্থার আদর্শ। অনেক সময় সুবিখ্যাত রাষ্ট্রপ্রধানরা আথেন্স শাসন করলেও স্বাধীন নাগরিকদের শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কারণ, রাষ্ট্রপ্রধানদেরও নাগরিদের ভোটেই নির্বাচিত হ'তে হ'ত।

স্পার্টা: ডোরিয়ান গ্রীকরা স্পার্টায় বসতি স্থাপন ক'রেছিল। এরা স্থানীয় অধিবাসীদের সকলকে ক্রীতদাসে পরিণত ক'রেছিল। ফলে এখানে স্পার্টানদের তুলনায় ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। শেষ পর্যন্ত এই সব ক্রীতদাস একবার বিদ্রোহ করে। স্পার্টানরা এই বিদ্রোহ দমন ক'রলেও সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকত এবং সংগীত, কাব্য ও শিল্পকলাকে দুর্বলতা জ্ঞানে ত্যাগ ক'রে কেবল যুদ্ধশিক্ষাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে।

পুরুষদের বাল্যকাল থেকেই যোদ্ধার জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'ত। শিশু দুর্বল হ'লে তাকে ফেলে দেওয়া হ'ত। সাত বছর বয়সে বালকরা সৈন্যাবাসে গিয়ে থাকত। সেখানে তাদের কঠোর শৃঙ্খলা, শরীরচর্চা এবং সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তাদের বুদ্ধিমান ক'রে তোলার জন্য চুরিও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। স্পার্টানদের কাছে চুরি অপরাধ ছিল না, চুরি ক'রে ধরা পড়াই ছিল অপরাধ। তাদের মন থেকে সকল প্রকার সুকুমারবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধি লোপ ক'রে দেওয়া হ'ত। যৌবনে তাদের সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করতে হ'ত। কৃষিকার্য, শ্রমশিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ঐসব কাজ ক্রীতদাসরাই ক'রত। এইভাবে স্পার্টানরা একটি যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হ'য়েছিল।

স্পার্টায় রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। তবে কোন রাজা যাতে স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠতে না পারেন, সেজন্য দুজন রাজা থাকতেন। অভিজাত শ্রেণী খুবই প্রবল ছিল। তারা রাজাদেরও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত ক'রত।

পারস্যের গ্রীক আক্রমণ: এশিয়া মাইনরে অবস্থিত গ্রীক উপনিবেশগুলি পারস্যের অধীন ছিল। গ্রীক উপনিবেশগুলি পারস্যের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রলে আথেন্স তাদের উৎসাহিত করে ও সাহায্য দেয়। পারস্য-সম্রাট দরায়ুস এই বিদ্রোহ দমন করে এবং আথেন্সকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আথেন্স আক্রমণ করেন। স্পার্টা আথেন্সের সাহায্যে অগ্রসর হয় না। তবু আথেন্স পারস্যের কাছে মাথা নত ক'রল না। পারসিক বাহিনী গ্রীসে অবতরণ ক'রলে আথেন্সের এক বীর যোদ্ধা **মিল্‌টিয়াডিস্‌** মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে **ম্যারাথনের** বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পারসিক বাহিনীকে বাধা দিলেন। গ্রীক সৈন্যদের বর্শার আঘাতে কয়েক হাজার পারসিক সৈন্য প্রাণ হারালো, অবশিষ্টরা জাহাজে ক'রে পালিয়ে গেল। এইভাবে দরায়ুসের আথেন্স অভিযান ব্যর্থ হ'ল।

এই বিজয়-সংবাদ নিয়ে এক তরুণ সৈনিক ম্যারাথন থেকে একটানা পঁচিশ মাইল দৌড়ে আথেন্সে পৌঁছলো এবং বিজয়-সংবাদ জানিয়েই পথশ্রমে প্রাণত্যাগ ক'রল। বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আজকাল **ম্যারাথন** দৌড় প্রচলিত হয়েছে। ম্যারাথনের বিজয়-বার্তা জানাবার জন্য প্রাণান্তকর দৌড়ের স্মরণেই এই দৌড় প্রবর্তিত হয়েছে।

এর দশ বছর পরে দরায়ুসের পুত্র সম্রাট **জেরেক্‌সিস** বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে গ্রীস আক্রমণ করেন। গ্রীসদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন বুঝে স্পার্টানরাও শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে যোগ দেয়। স্পার্টার রাজা **লিওনিডাস** সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে থার্মোপাইলির গিরিপথে পারসিক সৈন্যবাহিনীকে বাধা দেন। তাঁদের হাতে অসংখ্য পারসিক সৈন্য নিহত হয়। বিপুল বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে **লিওনিডাস** যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দেন। তাঁর বীরত্ব গ্রীসের ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছে। পারসিক বাহিনী আথেন্স অধিকার ক'রে পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু আথেন্সের নৌবাহিনী সালামিস ও মাইকেলের যুদ্ধে পারসিক নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। প্লাটিয়ার যুদ্ধেও পারসিক-বাহিনী পরাজিত হয়।

পারসিক বাহিনীর হাত থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করায় আথেন্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। আথেন্স এখন নৌশক্তিতে দুর্জয় হ'য়ে ওঠে। আথেন্সের নেতৃত্বে বহু গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ও উপনিবেশের একটি সংঘ স্থাপিত হয়। আথেন্স ঐসব

নগর-রাষ্ট্র ও উপনিবেশের উপর প্রভুত্ব করতে থাকে। সে অতুল সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হয়।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধঃ কিন্তু আথেন্সের এই শক্তি, সমৃদ্ধি ও সম্মানে স্পার্টা ঈর্ষান্বিত হয়। সে আথেন্স বিরোধী একটি সংঘ গড়ে তোলে এবং আথেন্সকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে। আথেন্সের দুর্ভাগ্য, এই সময় আথেন্সে এক মহামারী দেখা দেয়। তাতে তাদের জনবল হ্রাস পায়। মহামারীর পর তাদের জনপ্রিয় রাষ্ট্রপ্রধান পেরিক্লিসেরও মৃত্যু ঘটে। তবু আথেন্সবাসীরা হতোদ্যম হ'ল না। স্পার্টা ও তার সঙ্গী নগর-রাষ্ট্রগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে গেল। এই যুদ্ধ **পেলোপনেসীয় যুদ্ধ** নামে পরিচিত।

স্পার্টা জয়ী হ'ল। কিন্তু স্পার্টার গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। থিবিসের সঙ্গে যুদ্ধে স্পার্টা পরাজিত হল। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলায় আথেন্স, স্পার্টা ও থিবিস দুর্বল হ'য়ে পড়ল। গ্রীসে আর কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র রইল না। গ্রীসে নেতার স্থান নিল **ম্যাসিডন**।

৬

মানব-সভ্যতায় আথেন্সের দান

আথেন্স যখন সামরিক শক্তিতে দুর্জয় হয়ে উঠেছিল, তখন দেশে সামরিক নেতাদের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। **পেরিক্লিস** নামে এক বীর সেনাপতি আথেন্সের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটানা ত্রিশ বছর আথেন্সের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনি ঐ পদে পর পর ছ'বার নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। তাঁর শাসনকালই ছিল আথেন্সের স্বর্ণ যুগ। পেরিক্লিস কেবল বীর যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ শাসকই



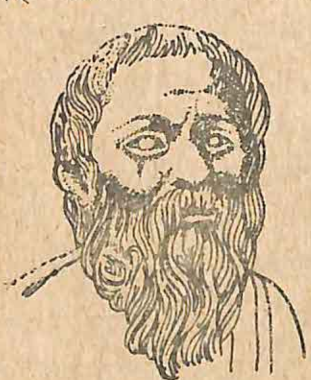
পেরিক্লিস

ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়েই গ্রীস দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও কলা-শিল্পে সর্বাধিক উন্নতি করেছিল। তিনি সমগ্র গ্রীস ও গ্রীসের উপ-নিবেশ থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের আথেন্সে আনেন এবং তাঁর নিজের ভাষায় আথেন্সকে ক'রে তোলেন 'গ্রীসের শিক্ষালয়'।



হেরোডটাস

তাঁর সময়েই গ্রীসদেশে নাট্য-সাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে। তখন ইস্‌কাইলাস, ইউরিপিদিস, সফোক্লিস, এরিস্টফেনিস প্রভৃতি নাট্যকারগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই যুগে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়। **হেরোডটাস** তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেন। হেরোডটাসকে **ইতিহাসের জনক** বলা হয়। **সক্রেটিস** ও **প্লেটোর** মতো শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরাও এই যুগেই জন্মেছিলেন। **সক্রেটিস** প্রশ্নোত্তরের ছলে তাঁর দার্শনিক মত প্রচার করতেন। তাঁর চিন্তা তাঁর বিখ্যাত শিষ্য প্লেটো লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। প্লেটোর রচনাগুলিও অমর হয়ে আছে। সক্রেটিসকে শেষ বয়সে রাজরোষে পড়তে হয় এবং বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তিনি হেমলক্ নামক এক বিষ-লতার রস পান ক'রে মৃত্যুবরণ করেন।



সক্রেটিস

গ্রীসদেশ এই সময় স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যেও এক অভাবনীয় উন্নতি করেছিল। জেরেক্‌সিস আথেন্স নগরীটি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। পেরিক্লিস আথেন্স নগরীটি পুনরায় প্রাসাদে, মন্দিরে, মূর্তিতে

সুশোভিত ক'রে তোলেন। বিখ্যাত ভাস্কর **ইক্‌টিনাস** আথেনা-দেবীর মন্দির **পার্থেনন** নির্মাণ করেন। বিখ্যাত ভাস্কর **ফিডিয়াস** আথেনার যে ব্রোঞ্জের মূর্তিটি নির্মাণ করেন, তার তুলনা নেই। অন্যান্য বহু শিল্পীও আথেন্সকে সুরম্য প্রাসাদে, মন্দিরে ও মূর্তিতে সজ্জিত করেন।

গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা বলতে প্রধানত আথেন্সের সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলাকেই বোঝায়।

৭

মাসিডন—আলেকজাণ্ডার

মাসিডন : রাজা ফিলিপ : গ্রীসদেশের উত্তরে মাসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল। মাসিডনের অধিবাসীরা গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং নিজেদের গ্রীক বলে ভাবত। মাসিডনের রাজা ফিলিপ গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি গ্রীক নগর-রাষ্ট্র থিবিসে থেকে গ্রীকদের কাছে যুদ্ধবিদ্যাও শিখেছিলেন। তিনি গ্রীক জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে একটি শক্তিশালী গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন এবং প্রথমে মাসিডনের উত্তরে অবস্থিত উপজাতিগুলিকে পদানত করলেন।

তিনি গ্রীক জাতির নেতৃত্ব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সকল গ্রীক রাষ্ট্র তা মেনে নিতে চাইলো না। কোন কোন গ্রীক রাষ্ট্র, যেমন আথেন্স, তাঁকে গ্রীক জাতির স্বাধীনতা-হরণকারী শত্রু বলে বর্ণনা করল। শেষ পর্যন্ত ফিলিপ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সারা গ্রীসে নিজের আধিপত্য বিস্তার করলেন। এখন তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। কিন্তু, এই সংকল্প সফল হওয়ার আগেই এক চক্রান্তের ফলে প্রাসাদেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

আলেকজাণ্ডার : ফিলিপের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র বিশ বছর বয়সে রাজা হ'লেন। বাল্যকাল থেকেই ফিলিপ, পুত্র আলেকজাণ্ডারকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী ক'রে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক

এরিষ্টটলকে আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে আলেকজাণ্ডার গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যাতেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। এই বীর, বুদ্ধিমান ও সুপুরুষ রাজপুত্র সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

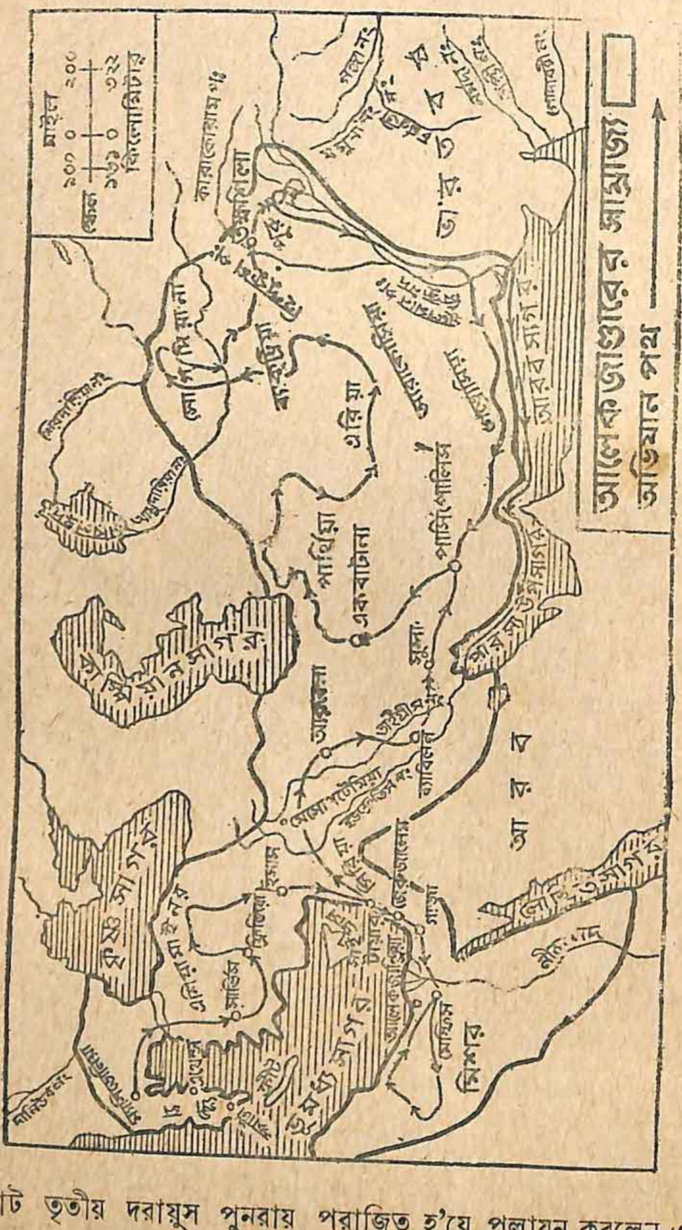

আলেকজাণ্ডার

তরুণ আলেকজাণ্ডার রাজা হওয়ায় অনেকে মনে করেছিল, মাসিডন খুব দুর্বল হ'য়ে পড়বে। তাই উত্তরের উপজাতিগুলি এবং আথেন্স, থিবিস প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রীক-রাষ্ট্র বিদ্রোহ করল। আলেকজাণ্ডার ক্ষিপ্রহস্তে ঐসব বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি বিদ্রোহী থিবিসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করলেন। গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে তিনি কেবল থিবিসে কবি পিণ্ডারের গৃহটিকে ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।

তারপর আলেকজাণ্ডার পারস্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে পারস্যের পদানত এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকে মুক্ত করলেন। তারপর তিনি সিরিয়ায় পৌঁছিলেন।

এখানে পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দরায়ুসের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'ল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তৃতীয় **দরায়ুস** পলায়ন করলেন এবং ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমগ্র অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে চাইলেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাতে সম্মত হ'লেন না। তিনি দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পারস্য-শাসিত মিশর অধিকার করলেন এবং মিশরে **আলেকজাণ্ড্রিয়া** নামে একটি নগর স্থাপন করলেন। এই নগরটি গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

আলেকজাণ্ডার মিশর জয় ক'রে মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে পারস্যের অভিমুখে চললেন। বেবিলনের নিকট একটি যুদ্ধে পারস্য-



সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস পুনরায় পরাজিত হ'য়ে পলায়ন করলেন এবং পরে নিহত হলেন। এইভাবে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য তাঁর পদানত

হ'ল। উত্তরে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ঐ সমস্ত ভূভাগ তাঁর অধিকারে গেল।

তারপর আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে পূর্বদিকে ভারতে অভিযান করলেন। ঐ সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিল না। অনেকেই স্বেচ্ছায় আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিল। কিন্তু ঝিলাম নদীর পূর্ব তীরে **পুরুরাজ্য** নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। পুরুরাজ আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তিনি ঝিলাম নদীর পূর্ব তীরে সৈন্য সমাবেশ করলেন। আলেকজাণ্ডার রাত্রির অন্ধকারে ঝিলাম নদী পার হয়ে পুরুরাজের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'ল। পুরুরাজ পরাজিত হ'য়ে বন্দী হলেন। আলেকজাণ্ডার পুরুরাজের দুঃসাহস ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি পুরুরাজকে মুক্তি দিয়ে গ্রীক-বিজিত ভারতীয় রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

অতঃপর আলেকজাণ্ডার ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাইলেন। ঐ সময়ে মগধে নন্দবংশীয় রাজা রাজত্ব করছিলেন। তাঁর রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর কথা গ্রীক সৈন্যরা শুনেছিল। তাছাড়া, তারা বহুদিন দেশ ছেড়ে এসেছিল। তাই তারা আর অগ্রসর হ'তে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো। তখন আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে চললেন। পথে বেবিলনে তিনি হঠাৎ জ্বর রোগে আক্রান্ত হ'লেন এবং মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

৮

গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন—রোমান আক্রমণ

আলেকজাণ্ডারের অকস্মাৎ মৃত্যু হ'লে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর প্রধান প্রধান সেনাপতিরা এই বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন। তাঁর প্রধান প্রধান সেনাপতি ছিলেন—**সেলুকাস, টোলেমি** ও **এন্টিগোনাস**।

সুদীর্ঘকাল তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ চলল; অবশেষে আলেকজাণ্ডার-বিজিত সাম্রাজ্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিলেন। সেলুকাসের অংশে পড়ল এশীয় অঞ্চল, টোলেমির অংশে পড়ল মিশর এবং এন্টিগোনাসের অংশে পড়ল মাসিডন ও গ্রীস।

আলেকজাণ্ডার যখন পূর্বে সাম্রাজ্য বিস্তার করছিলেন, তখন গ্রীসের পশ্চিমে রোমানরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হ'ল। ফলে, প্রথমে মাসিডন ও গ্রীস, তারপরে গ্রীক-শাসিত এশীয় অঞ্চল এবং সর্বশেষে মিশর রোমানদের অধিকারে গেল। খ্রীষ্ট পূর্ব ৩১ অব্দে মিশরের টোলেমি-বংশীয় শেষ রানী **ক্লিওপেত্রা** আত্মহত্যা করলে, আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। গ্রীসদেশ কোথায় অবস্থিত? গ্রীস বলতে তোমরা কি বোঝ? গ্রীকরা কোন্ জাতির লোক ছিল? কোন্ পথে তারা এখানে বসতি বিস্তার করেছিল? গ্রীকদের কয়েকটি প্রধান উপজাতির নাম কর।

২। ক্রীট কোথায় অবস্থিত? এর রাজধানীর নাম কি? ক্রীটান সভ্যতা সম্পর্কে কি জান?

৩। হোমার কে ছিলেন? হোমারীয় যুগ বলতে কি বোঝ? হোমারীয় যুগের গ্রীক সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। গ্রীক দেবদেবী সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। গ্রীস ও ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনী লিখ।

৬। গ্রীসে কেন নগর রাষ্ট্রগুলি গড়ে উঠেছিল? গ্রীক জাতির ঐক্যের পথে অন্তরায় কি ছিল? গ্রীসের প্রধান দুইটি নগর-রাষ্ট্রের নাম কর।

৭। স্পার্টা কোথায় অবস্থিত? স্পার্টানদের সমাজ, জীবনযাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৮। আথেন্সের সমাজ ও জীবনের আদর্শ সম্পর্কে কি জান?

৯। পারস্যের গ্রীক আক্রমণের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১০। আথেন্স কিভাবে গ্রীসে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল? স্পার্টার ঈর্ষার কারণ কি? এই ঈর্ষার ফল কি হয়েছিল?

১১। মাসিডন কোথায় অবস্থিত? মাসিডনের লোকরা কি গ্রীক ছিল? তারা নিজেদের গ্রীক ব'লে ভাবত কেন?

১২। মাসিডনরাজ ফিলিপ সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৩। আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনলাভ ও দিগ্‌বিজয় সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৪। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের অবস্থা কি হয়েছিল?

১৫। গ্রীক সাম্রাজ্যের বিলোপ কিভাবে ঘটলো?

১৬। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) প্রাচীন গ্রীসের মহাকবির নাম —। তিনি যে মহাকাব্যগুলি রচনা করেন, সেগুলির নাম — ও —। (খ) মাইসেনির রাজা ছিলেন —। তাঁর ভাইয়ের নাম —। তিনি — রাজা ছিলেন। ট্রয়ের রাজা — এর পুত্রের নাম —। তিনি — র সুন্দরী পত্নী — কে অপহরণ করেন। (গ) গ্রীসের দক্ষিণাংশের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল —। মধ্য-গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল —। (ঘ) দরায়ুসের সৈন্যবাহিনী — এর যুদ্ধে গ্রীক সেনাপতি —-র হস্তে পরাজিত হয়। (ঙ) স্পার্টার রাজা — বীরত্বের সঙ্গে পারসিক বাহিনীর প্রতিরোধ করে মৃত্যুবরণ করেন। আথেন্স পারসিক নৌ-বহরকে — ও — -এ যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে। (চ) আথেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন —। আথেন্সের ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন —। স্থপতি — আথেনাদেবীর মন্দির — নির্মাণ করেন। ভাস্কর — আথেনাদেবীর একটি অপূর্ব ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণ করেন। ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররা ছিলেন —, —, — ও —। — -কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। (ছ) গ্রীসের — মাসিডন অবস্থিত ছিল। মাসিডনের রাজা — মাসিডনকে শক্তিশালী করেন। তাঁর সাম্রাজ্য দক্ষিণে — থেকে উত্তরে — পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যকে তাঁর তিন সেনাপতি —, — ও — ভাগ ক'রে নেন। মিশরের টোলেমি-বংশীয় শেষ রানী — আত্মহত্যা করলে, আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

রোম

১

রোমের প্রতিষ্ঠা

ইটালীতে বিভিন্ন জাতির বসতি-স্থাপন: গ্রীসের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে **ইটালি** নামে এক উপদ্বীপ আছে। উত্তরদিকে আল্‌প্‌স্ পর্বতমালা দ্বারা ও তিন দিকের অধিকাংশ সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। ইটালির সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূমি বেশ উর্বর। তাই সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এখানে এসে বসবাস করছিল।

গ্রীসে যেমন আর্য জাতির এক শাখা উত্তর থেকে অগ্রসর হয়ে বসতি স্থাপন করেছিল, ইটালিতেও তেমনি আর্য জাতির অন্য একটি শাখা উত্তর থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এগুলির মধ্যে **ল্যাটিন উপজাতিগুলিই** ছিল প্রধান। ক্রীট ও ট্রয়ের সভ্যতা বিধ্বস্ত হ'লে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক ইটালিতে এসে বসবাস করেছিল। এরা **এট্রাস্কান** নামে পরিচিত। গ্রীক উপনিবেশ কারীরা দক্ষিণ ইটালিতে ও সিসিলি দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিল।

রোমের প্রতিষ্ঠা : এট্রাস্কানরা সম্ভবত সমুদ্রপথে এসে উত্তর ইটালিতে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা সভ্য হ'লেও, এরা ছিল দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর। তাই ল্যাটিন উপজাতিগুলিকে পদানত করতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ল্যাটিন উপজাতির লোকরাও তাই মধ্য ইটালিতে **টাইবার** নদীর দক্ষিণ তীরে **প্যালেটাইন** পাহাড়ে একটি সুরক্ষিত নগর গড়ে তুলেছিল। এই নগরই **রোম**। কথিত আছে, রোম নগরী খ্রীষ্ট পূর্ব ৭৫৬ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিংবদন্তীতে বলা হয়, **রোম্যুলাস** নামে এক বীর রাজকুমার এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুসারেই এই নগরীর নাম হয়েছিল **রোম**।

২
গোড়ার যুগের রোমান সমাজ—প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান

গোড়ার যুগের রোমান সমাজ : রোমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ল্যাটিন উপজাতিগুলি নিয়েই গোড়ার যুগে রোমান সমাজ গড়ে উঠেছিল। এরা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। আবার এরা পশুপালনও ক'রত। সামান্য কিছু শিল্পসামগ্রী উৎপাদন করলেও বিনিময়ের মাধ্যমে এরা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করত। এরা গোড়ার দিকে গ্রীক বা এট্রাস্কানদের মতো সভ্য ছিল না। গ্রীক ও এট্রাস্কানদের সংস্পর্শে এসে এরা ক্রমেই সভ্য হয়ে উঠতে থাকে। এরা সম্ভবত গোড়ার দিকে অন্যান্য আর্য উপজাতির মতো প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহের পূজা করত। সম্ভবত গ্রীকদের অনুকরণেই এরা নানা দেবদেবীর উপাসনা করতে থাকে। তাদের দেবরাজ ছিলেন **জোভ**

বা **জুপিটার**। যুদ্ধের দেবতা ছিলেন **মার্স**। বাণিজ্যের দেবতা **মারকারি** এবং বিদ্যার দেবী **মিনার্ভা**।

রোমান সমাজে গোড়ার দিকে রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। কিছুদিন রোমানরা এট্রাস্কানদের পদানত হয়েছিল এবং এট্রাস্কান রাজা রোম শাসন করত। এট্রাস্কান রাজাদের বলা হ'ত **টারকুইন**। টারকুইনরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। শেষ টারকুইনকে বিতাড়িত ক'রে রোমানরা রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রাজতন্ত্র সম্পর্কে ভয় ও ঘৃণা তাদের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকে।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানঃ রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লেও অভিজাতরাই শাসনকার্য চালাতেন। অভিজাতদের বলা হ'ত **প্যাট্রিসিয়ান**। আর সাধারণ নাগরিকদের বলা হ'ত **প্লেবিয়ান**। প্যাট্রিসিয়ানরা প্লেবিয়ানদের ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

দু'জন **কন্‌সাল** রোমের শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এঁরা এক বছরের জন্য জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হ'তেন। এই পদের জন্য প্লেবিয়ানরা কেউ প্রার্থী হ'তে পারত না। দেশে সংকট দেখা দিলে, ছ'মাসের জন্য সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একজন **ডিক্টেটর** নিযুক্ত হতেন। শাসন ও বিচার কার্যের জন্য ছিলেন নির্বাচিত **ম্যাজিস্ট্রেটরা**। শাসনকার্যে পরামর্শ দানের জন্য ছিল একটি **সেনেট** বা উচ্চ পরিষদ। এইসব পদেও প্লেবিয়ানদের নিযুক্ত হওয়ার কোন অধিকার ছিল না।

প্যাট্রিসিয়ানরা সকলেই ধনী জমিদার ছিলেন। তাঁরা নানাভাবে প্লেবিয়ানদের শোষণ করতেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে আইন করতেন। বিচার ও শাসনব্যবস্থাও তাঁদের স্বার্থে চলত। এইসব অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্লেবিয়ানরা প্রতিবাদ করত। ফলে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। তবে এই সংঘর্ষ কখনও সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হ'ত না। প্লেবিয়ানরা দলবদ্ধভাবে শহর ছেড়ে চলে গিয়ে অন্যত্র বসবাস করত। তখন প্যাট্রিসিয়ানরা বাধ্য হয়ে তাদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনতেন।

এইভাবে প্লেবিয়ানরা তাদের অনেক অধিকার আদায় করেছিল।

তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য **ট্রিবিউন** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রতিনিধিমণ্ডল প্যাট্রিসিয়ানদের স্বার্থে ইচ্ছামতো আইন প্রয়োগ করতেন। যাতে তা না হ'তে পারে, সেজন্য আইনগুলিকে এখন বিধিবদ্ধ ক'রে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। পূর্বে প্লেবিয়ানের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ানের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এখন ঐরূপ বিবাহ বৈধ হ'য়েছিল। প্লেবিয়ানরা সকল উচ্চ পদেই নিযুক্ত হওয়ার অধিকার পেয়েছিল। প্লেবিয়ানদের পরিষদ কোনও আইন করলে তখন প্যাট্রিসিয়ানদেরও তা মানতে হ'ত।

৩

কার্থেজের সঙ্গে বিরোধ ও যুদ্ধ

রোমের অধিকার বিস্তার: রোম ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। টাইবার নদীর উত্তরে অবস্থিত এট্রাস্কান অঞ্চল জয় ক'রে উত্তর ইটালি পর্যন্ত তার অধিকার বিস্তৃত করেছিল এবং দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে অন্যান্য উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি জয় করেছিল। দক্ষিণ ইটালির পাদদেশে অবস্থিত গ্রীক রাজ্যটিও তার অধিকারে আসে। এইভাবে রোম সারা ইটালিতে অধিকার বিস্তার করে।

কার্থেজ: ইটালির ঠিক দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে **কার্থেজ** নামে একটি নগরী ছিল। এই নগরীকে কেন্দ্র ক'রে **ফিনিসীয়** জাতির লোকরা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে ও দক্ষিণ স্পেনে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল। ইটালির অধিকার ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, কার্থেজের সঙ্গে ইটালির সংঘর্ষ বাধল।

কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ: ভূমধ্যসাগরে সিসিলি দ্বীপের পশ্চিমাংশ এবং কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপ কার্থেজের অধিকারে ছিল। সিসিলি দ্বীপের পূর্বাংশে **সাইরাকিউজ** নামে একটি গ্রীক রাজ্য ছিল। রোম সাইরাকিউজ অধিকার করলে কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধ তিনবার হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলি **পিউনিক যুদ্ধ** নামে পরিচিত। পিউনিক শব্দের অর্থ ফিনিসীয়।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ: রোম সিসিলি দ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত গ্রীক রাজ্য সাইরাকিউজ অধিকার করেছিল। সিসিলি দ্বীপের

পশ্চিমাংশ কার্থেজের অধিকারে ছিল। কার্থেজ রোমের প্রতিরোধে অগ্রসর হ'লে কার্থেজ ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বাধল (খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ অব্দ)। এই যুদ্ধ তেইশ বছর ধরে চলে। নৌ-শক্তিতে বলীয়ান কার্থেজকে গোড়ার দিকে পরাজিত করা রোমের পক্ষে কঠিন ছিল। কিন্তু রোমও শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গ'ড়ে তুললো এবং শেষ পর্যন্ত কার্থেজকে পরাজিত করল। এই যুদ্ধের ফলে সিসিলি, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া রোমের অধিকারে গেল।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ: ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য হারিয়ে কার্থেজ এখন স্থলভাগে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাইল। কার্থেজের নেতা হানিবল বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর স্পেনেও অধিকার বিস্তারে অগ্রসর হলেন। স্পেনের এব্রো নদী পর্যন্ত ভূভাগ ছিল রোমের অধিকারে। হানিবল এব্রো নদী পার হ'লে, রোমের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। কয়েকটি যুদ্ধে রোম পরাজিত হয়ে পিছু হটলো। হানিবল রোমানদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে আল্‌পস্ পর্বতমালা পার হয়ে উত্তর দিক থেকে ইটালিতে প্রবেশ করলেন। তিনি কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করলেন। রোমানরা সম্মুখ সমরে হানিবলকে পরাজিত করা অসম্ভব জেনে, তারা কালহরণের নীতি গ্রহণ করল। খ্রীষ্ট পূর্ব ২১৮ থেকে ২০২ অব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। শেষে রোমানরা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কার্থেজ আক্রমণ করল। রোমান-বাহিনীর হাতে কার্থেজ বিপন্ন হওয়ায় হানিবল দ্রুত সসৈন্যে কার্থেজে ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি জামার যুদ্ধে রোমানদের কাছে পরাজিত হলেন। কার্থেজ রোমের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল। সমগ্র স্পেন এবং কার্থেজের নৌ-বহর রোমের অধিকারে গেল। হানিবল পালিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ: কার্থেজ এইভাবে হীনবল হ'য়ে পড়লো। কিন্তু পরবর্তী চল্লিশ বছরে সে নিজেকে শক্তিশালী ক'রে তুলল। তা' দেখে রোম কার্থেজ আক্রমণ করল এবং কার্থেজ নগরকে চিরতরে ধ্বংস ক'রে দিলো। কার্থেজ-অধিকৃত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা রোমের অধিকারে গেল (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দ)।

৪
রোমান নাগরিকতা—ক্রীতদাস-প্রথা—ক্রীতদাস-বিদ্রোহ

রোমান নাগরিকতা : গোড়ার যুগে রোম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ল্যাটিন উপজাতির লোকেরাই রোমের নাগরিক ছিল। রোম যতই নূতন নূতন স্থান অধিকার করল, ততই সেইসব অধিকৃত স্থানের অধিবাসীরাও রোমের নাগরিক হ'তে লাগল। পরে রোম সাম্রাজ্য যখন ইংলণ্ড থেকে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত এবং দক্ষিণ রাশিয়া থেকে সাহারা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তখন ঐসকল স্থানের স্বাধীন অধিবাসীরাও রোমের নাগরিক হ'ল। ঐসব অঞ্চলের অধিবাসী কোন নাগরিক রোমে কোন নির্বাচনকালে উপস্থিত থাকলে তারা নির্বাচনে ভোট দিতে পারত। তবে কোন ক্রীতদাসদের নাগরিকত্ব ছিল না।

ক্রীতদাস প্রথা : সুপ্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর নানা দেশে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল। ক্রীতদাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হ'ত না। তারা ছিল তাদের মালিকদের সম্পত্তি, মালিকরা তাদের কেনা-বেচা করত। জীবনধারণের মতো খাদ্যবস্ত্র ও বাসস্থান তাদের দেওয়া হ'ত। তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হ'ত এবং তাদের উপর সামান্য কারণে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করা হ'ত। মালিক তাদের খুন ক'রে ফেললেও, তা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত না।

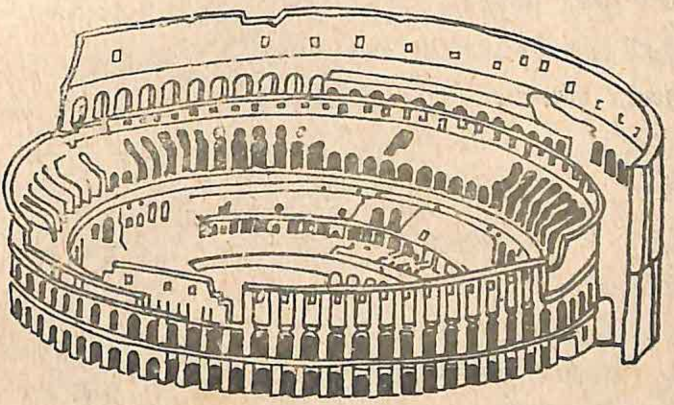


রোমান ক্রীতদাস

রোমানরা নূতন নূতন দেশ জয় ক'রে দেশে অসংখ্য ক্রীতদাস আনছিল। রোমানরা হয় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকত, নয় বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকত। তাই ক্রীতদাসদের দিয়ে সকল প্রকার কাজ করানো হ'ত। রোমে ক্রীতদাস-প্রথা

যেমন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল, তেমনি ক্রীতদাসদের জীবনও দুঃসহ ও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

গ্ল্যাডিয়েটর ঃ রোমানরা ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে হিংস্র ঘটনা ও রক্তপাতে আনন্দ পেতে লাগলো। ফলে দেশে ক্রীতদাসদের লড়াই চালু হ'ল। লড়াই করার জন্য ক্রীতদাসদের লড়াই শেখানো হ'ল। এজন্য অনেক শিক্ষালয়ও স্থাপিত হ'ল। লড়াইয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের বলা হ'ত **গ্ল্যাডিয়েটর**। গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই দেখাবার জন্য দেশে অনেক প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হ'ল। এগুলিকে বলা হ'ত



রোমের কলোসিয়াম

অ্যাম্‌ফিথিয়েটার ও কলোসিয়াম। অ্যাম্‌ফিথিয়েটারে বা কলোসিয়ামে একসঙ্গে হাজার হাজার দর্শক লড়াই দেখে আমোদ করত।

স্পার্টাকাস ও ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঃ গ্রীস থেকে স্পার্টাকাস নামে একজন ক্রীতদাস এসেছিল রোমে। গ্ল্যাডিয়েটর-রূপে সে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। সে ছিল প্রচণ্ড বীর যোদ্ধা। তার লড়াই দেখার জন্য হাজারে হাজারে মানুষ ভিড় করত। গ্ল্যাডিয়েটরকে লড়াই করতে হ'ত গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রে এরা সঙ্গী ও বন্ধুও হ'ত। এইসব কাজে স্পার্টাকাসের মন সায় দিত না। রোমানদের কাছে তাদের জীবনের যে কোন মূল্য নেই, তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য গ্ল্যাডিয়েটররাও এই মনোভাব পোষণ

করত। দীর্ঘকাল দুঃসহ অবিচার ও অত্যাচারের ফলে দেশের ক্রীতদাসদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

অবশেষে একদিন স্পার্টাকাস লড়াই দেখবার সময় বিদ্রোহ করলো তার সঙ্গে অন্যান্য গ্ল্যাডিয়েটাররাও যোগ দিল। স্পার্টাকাস তার বিদ্রোহী সঙ্গীদের নিয়ে বিস্যুবিয়াস আগ্নেয়গিরির সুপ্ত জ্বালামুখীতে গিয়ে আশ্রয় নিলো। সারা দেশে ক্রীতদাসরাও বিদ্রোহে যোগ দিল। তারা রোমান নাগরিকদের হত্যা করলো, তাদের বাড়িতে আগুন দিল, তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করলো। ক্রীতদাসের এই বিদ্রোহ সারা ইটালিতে আতঙ্ক সঞ্চার করল। রোমানরা দু'বছর ধরে এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'ল। অবশেষে রোমান সেনাপতি **ক্র্যাসাস** এই বিদ্রোহ দমন করলেন (খ্রীঃ পূঃ ৭১ অব্দ)। স্পার্টাকাস নিহত হ'ল। প্রায় ছ হাজার বিদ্রোহী ক্রীতদাস বন্দী হ'লো। ঐসব বিদ্রোহী ক্রীতদাসদের রোম থেকে বিস্তৃত ইটালির বিখ্যাত রাজপথ অ্যাপিয়ান ওয়ের দু'ধারে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল।

৫

জুলিয়াস সাজার—প্রজাতন্ত্রের অবসান—নূতন সাম্রাজ্য

জুলিয়াস সীজার ঃ রোম তখন সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত ছিল। এজন্য সে বিশাল সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলেছিল। সৈন্যবাহিনীর দুর্ধর্ষ সেনাপতিরা সাম্রাজ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ক্রীতদাস-বিদ্রোহ দমন ক'রে **ক্র্যাসাস** খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আর দুজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন **পম্পি** ও **জুলিয়াস সীজার**। এঁদের নিয়ে রোমে **ট্রায়াম্‌ভিরেট** বা তিনজনের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। এঁরা সাম্রাজ্যের কোন্ অংশতে যুদ্ধ ও শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন, তা-ও স্থির ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এঁরা তিনজনেই ছিলেন অতিশয়



জুলিয়াস সীজার

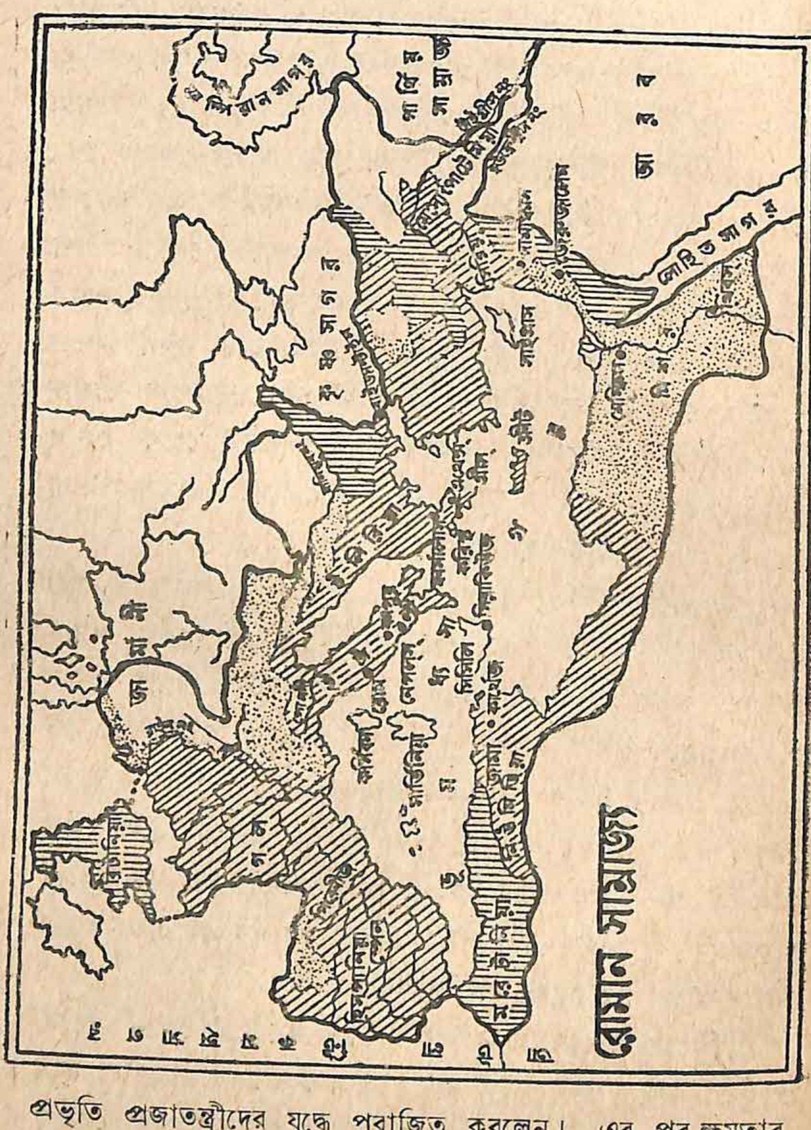
উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনজনেই রোম সাম্রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।

পারস্য-আক্রমণকালে সেনাপতি ক্র্যাসাস নিহত হ'লে, পম্পি ও জুলিয়াস সীজার ক্ষমতা অধিকারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন। জুলিয়াস সীজার ছিলেন সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে। তিনি ফ্রান্স ও বেলজিয়াম অধিকার করেছিলেন এবং ইংলণ্ডে দু'বার অভিযান চালিয়েছিলেন। পম্পি ছিলেন সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। রোমের সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকারের জন্য জুলিয়াস সীজার দ্রুত সসৈন্যে রোম অভিযানে চললেন। তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে পম্পি সসৈন্যে ছুটে এলেন তাঁকে বাধা দিতে। ফলে পম্পি ও জুলিয়াস সীজারের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পম্পি মিশরে পালিয়ে গেলেন এবং সেখানে নিহত হ'লেন। জুলিয়াস সীজার মিশর অধিকার করলেন। তারপর তিনি বিজয়ীর বেশে রোমে ফিরে এলেন। তিনি সারাজীবনের জন্য রোমের সর্বময় কর্তা বা একাধিনায়ক নির্বাচিত হলেন (খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৫ অব্দ)।

প্রজাতন্ত্রের অবসানঃ জুলিয়াস সীজার সারাজীবনের জন্য একাধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ায় কার্যত তিনি রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হ'লেন। কিন্তু রোমানদের রাজতন্ত্রের প্রতি ভীতি ও ঘৃণা থাকায় তিনি তা মুখে স্বীকার করলেন না। তাঁর ভক্তরা তাঁকে রাজমুকুট পরাতে চাইলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। মিশরের ফারাওরা দেবতা ব'লে গণ্য হ'তেন। জুলিয়াস সীজার মিশরে ছিলেন এবং মিশরের রানী ক্লিওপেত্রার প্রভাবে পড়েছিলেন। তিনি ফারাওদের অনুকরণে নিজেকে দেবতা ব'লে প্রচার করলেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে তাতে নিজের মূর্তি স্থাপন করলেন।

জুলিয়াস সীজার যে নিজেকে রাজা বা সম্রাট্ ব'লে মনে করছেন, তা বুঝতে কারো বাকী রইল না। এতে দেশের প্রজাতন্ত্রীরা ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা **ব্রুটাস, কেইয়াস** প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রীদের নেতৃত্বে এক চক্রান্ত করলেন এবং একদিন সেনেট-ভবনে জুলিয়াস সীজারকে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে ছুরিকাঘাতে হত্যা করলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দ)।

জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুতে কিন্তু প্রজাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ল না। জুলিয়াস সীজারের একান্ত অনুগামী সেনাপতি মার্ক অ্যাণ্টনি ও জুলিয়াস সীজারের তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টাভিয়াস সীজার ব্রুটাস



প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রীদের যুদ্ধে পরাজিত করলেন। এর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলল মার্ক অ্যাণ্টনি ও অক্টাভিয়াস সীজারের মধ্যে। অবশেষে মার্ক অ্যাণ্টনি পরাজিত হ'য়ে আত্মহত্যা করলেন। এখন অক্টাভিয়াস

সীজার হ'লেন রোম সাম্রাজ্যের একাধিনায়ক। তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা না করলেও তিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে প্রথম রোম সম্রাট। তিনি **অগাস্টাস** বা মহিমান্বিত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাই তিনি **অগাস্টাস সীজার** নামেও পরিচিত।

নব রোম সাম্রাজ্য ঃ এতদিন রোম সাম্রাজ্য রোমান প্রজাতন্ত্রের অধীনেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন থেকে রোম সাম্রাজ্য সম্রাটদের শাসনাধীন হ'ল। অগাস্টাস সীজার ৪১ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি সারা সাম্রাজ্যে শাসনের সুব্যবস্থা করেন। ফলে সারা সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শান্তি-শৃঙ্খলা প্রায় দু'শ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ঐ সময়কে 'রোমান শান্তির যুগ' বলা হয়। সম্রাট ট্রাজান ও হাড্রিয়ানের সময়ে রোম সাম্রাজ্য আরো বিস্তার লাভ করেছিল। রোম সাম্রাজ্য পূর্বে ইউফ্রেটিস নদী থেকে পশ্চিমে ইংলণ্ড এবং দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি থেকে উত্তরে রাইন ও ডানিয়ুব নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৬

রোম সাম্রাজ্যের পতন

অগাস্টাস সীজারের উত্তরাধিকারীরা সকলে বংশপরম্পরায় রাজত্ব করেন নি। তাঁরা প্রায়ই সৈন্যবাহিনী ও সেনেটের অনুমোদন-ক্রমে সম্রাট হতেন। এঁদের অনেকে সুযোগ্য ছিলেন, আবার অনেকে ছিলেন অপদার্থ, নৃশংস—এমন কি উন্মাদ। সৈন্যবাহিনী ও প্রাসাদরক্ষী বাহিনী খুবই পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল ; প্রায়ই তারা সম্রাটদের সিংহাসনে বসাতো, সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করত। ফলে এইসব সম্রাট তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়তেন। সুযোগ্য সম্রাটরা সৈন্যবাহিনী ও প্রাসাদরক্ষী বাহিনীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

রোম বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়ায় তার ধনদৌলতের অভাব ছিল না। তাই এক শ্রেণীর নাগরিকরা বিলাস-ব্যসনে গা ঢেলে দিয়েছিল। দেশে মুদ্রার প্রচলন থাকায় নানাভাবে সাধারণ মানুষকে

শোষণের সুবিধা হয়েছিল। ফলে, এক শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। বাইরে থেকে গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি জাতির দুর্ধর্ষ লোকরা প্রায়ই রোম সাম্রাজ্যে হানা দিচ্ছিল। রোমানরা সর্বদা বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকায় ঐ সব দুর্ধর্ষ জাতির লোক সৈন্য-বাহিনীতে বিপুল সংখ্যায় স্থান দিতে হয়েছিল। এরা প্রায়ই দেশে নানা সংকট সৃষ্টি করত। সাম্রাজ্য সুবিশাল হওয়ায় দূরবর্তী প্রদেশগুলি সব সময় শাসনকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হ'য়ে উঠেছিল।

এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য সম্রাট **কনস্টান্টাইন** সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে বসফোরাস প্রণালীর কাছে প্রাচীন **বাইজান্টিয়ামে** দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এর নূতন নাম হয় **কনস্টান্টি-নোপল**। সম্রাট কন্স্টান্টাইনের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম অংশের রাজধানী হয় **রোম** এবং পূর্ব অংশের রাজধানী হয় **কনস্টান্টিনোপল**।

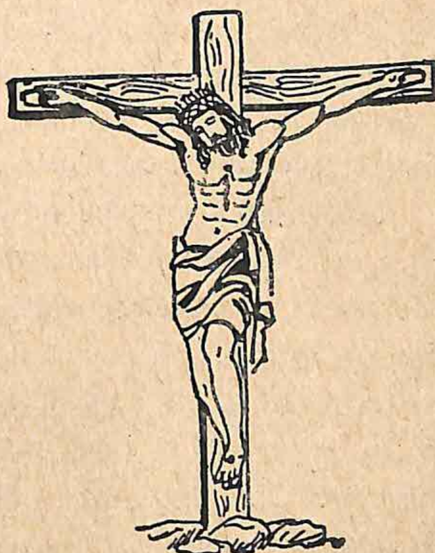
রোম সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার সুযোগে গথ, ভ্যাণ্ডাল, টিউটন, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি আর্যজাতির লোকরা এবং মঙ্গোলজাতীয় হূণরা রোম সাম্রাজ্যের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতন হয় রোম সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হ'তে এরপর আরো প্রায় ন'শ বছর লাগে।

৭

খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান

যিশু খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম: ইহুদীদের বাসভূমি **জুডিয়া** ছিল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সম্রাট অগাস্টাস সীজারের রাজত্বকালে এখানে **জেরুজালেম শহরের** কাছে **বেথ্‌লেহেমে** এক দরিদ্র ইহুদী পরিবারে যিশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। যিশুর বাবার নাম **জোসেফ** ও মায়ের নাম **মেরী**। যিশু খ্রীষ্ট ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর নবধর্মের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। ঐ ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত।

ইহুদীদের দেবতা ছিলেন **জিহোভা**। তিনি ছিলেন, ইহুদীদের মতে, ইহুদী জাতির শত্রুদের দমনকারী এবং ইহুদী জাতির পরিত্রাতা। কিন্তু যিশু বললেন, ঈশ্বর কোনও বিশেষ জাতির পরিত্রাতা ও মঙ্গল-সাধক নন, ঈশ্বর সকল মানুষেরই মঙ্গলদাতা ও পরিত্রাতা। তিনি মানুষ-মাত্রেরই পিতা, সকল মানুষই তাঁর সন্তান। সুতরাং মানুষমাত্রেই ভাই-ভাই। সুতরাং মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা ও ঘৃণা মহাপাপ। কাউকে হিংসা না করা এবং সকলকে সমানভাবে ভালোবাসাই প্রকৃত ধর্ম।



যিশু খ্রীষ্ট

যিশু অহিংসা, প্রেম, ক্ষমা ও সাম্যের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তিনি গল্পচ্ছলে তাঁর বাণীগুলি প্রচার করতেন। তাই সহজে মানুষ তা বুঝতে পারতো এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। তিনি বললেন, পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা ক'রো না। তোমার এক গালে কেউ চড় মারলে, তাকে অপর গালটি পেতে দাও। তোমার গামছাটি কেউ চুরি করলে, তাকে তোমার কম্বলটি দাও। সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উট যেমন গলতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীও প্রবেশ করতে পারে না।

কিন্তু এইসব বাণী ছিল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী, বিশেষত ইহুদীদের ধর্মমতের বিরোধী। তাই ইহুদীরা রোমান শাসনকর্তার কাছে যিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। যিশু বলেছিলেন, শীঘ্রই পৃথিবীতে 'ঈশ্বরের রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হবে। সেইজন্য তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধেও অভিযুক্ত করা হ'ল।

বিচারে যিশুর প্রাণদণ্ড হ'ল। তাঁকে সামান্য চোরদের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে হত্যা করা হ'ল। মৃত্যুকালেও তিনি ক্ষমার আদর্শ প্রচার ক'রে গেলেন। তিনি বললেন, "এরা কি করছে তা জানে না, ঈশ্বর এদের ক্ষমা করুন।"

যিশুর বাণী দলে দলে মানুষকে আকৃষ্ট করল এবং খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা **খ্রীষ্টান** নামে পরিচিত হ'ল।

খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি লাভ : খ্রীষ্টধর্ম প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী ছিল। এতে অহিংসার কথা বলায় যুদ্ধের বিরুদ্ধেও বলা হয়েছিল, যা রোম সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তিতে আঘাত করেছিল। এতে ধনলিপ্সার নিন্দা করা হয়েছিল ; এতে রোমানদের প্রচলিত ধর্মেরও বিরোধিতা করা হয়েছিল ; এইসব নানা কারণে খ্রীষ্টানদের উপর অশেষ নির্যাতন চালানো হ'ল। তাদের হত্যা করা হ'ল, আগুনে পুড়িয়ে মারা হ'ল, হিংস্র জন্তুদের দিয়ে খাওয়ানো হ'ল। কিন্তু তবু খ্রীষ্টধর্মকে রোধ করা গেল না। দলে দলে মানুষ খ্রীষ্টান হ'ল। বিশিষ্ট রোমান নাগরিকরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। শেষে রোম সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন নিজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এখন থেকে খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেল। অল্পকালের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম সারা ইউরোপে বিস্তার লাভ করল।

প্রশ্নাবলী

১। রোম কি? রোম কোন্ দেশে কোথায় অবস্থিত? ঐ স্থানে রোম নগর প্রতিষ্ঠার কারণ কি? কখন রোম নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা হয়? কার নাম থেকে রোমের নামকরণ হয়েছিল বলা হয়?

২। এট্রাস্কান জাতীয় লোকেরা কোথা থেকে এসেছিল। রোমানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? রোমের এট্রাস্কান রাজাদের কি বলা হ'ত? রোমে কিভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৩। রোমান প্রজাতন্ত্রে যে দুজন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী নির্বাচিত ব্যক্তি থাকতেন, তাঁদের কি বলা হ'ত? সংকটকালে যে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী ব্যক্তি নির্বাচিত হতেন, তাঁকে কি বলা হ'ত? তিনি কতদিনের জন্য নির্বাচিত হতেন? দেশের বিচার ও শাসন চালাবার জন্য যে নির্বাচিত ব্যক্তিরা থাকতেন,

তাঁদের কি বলা হ'ত ? শাসন-পরিচালনায় পরামর্শদানের জন্য যে উচ্চ পরিষদ থাকত, তার নাম কি ?

৪। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান বলতে কাদের বোঝায় ? এদের মধ্যে সংগ্রাম চলত কেন ? প্লেবিয়ানরা কিভাবে সংগ্রাম চালাত ? সংগ্রামের ফলে তারা কি কি অধিকার আদায় করেছিল ?

৫। কার্থেজ কোথায় অবস্থিত ছিল ? কারা কার্থেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল ? কার্থেজের সাম্রাজ্য কোথায় বিস্তৃত ছিল ? রোমানদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধেছিল কেন ? ঐ যুদ্ধকে কি বলা হয়। ঐ যুদ্ধ ক'বার হয়েছিল ?

৬। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮। রোমান নাগরিকত্ব সম্বন্ধে কি জান ?

৯। গ্ল্যাডিয়েটর কাকে বলে ? স্পার্টাকাস কে ছিলেন ? তিনি কেন বিদ্রোহ করেছিলেন ? ঐ বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল ?

১০। ট্রায়াম্ভিরেট বলতে কি বোঝ ? কাদের নিয়ে ট্রায়াম্ভিরেট গঠিত হয়েছিল ?

১১। জুলিয়াস সীজারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১২। রোমের প্রথম সম্রাট কে ? তাঁর ক্ষমতালাভ সম্পর্কে কি জান লিখ।

১৩। নূতন রোম সাম্রাজ্য বলতে কি বোঝ ? রোম সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

১৪। রোম সাম্রাজ্য পতনের কারণ কি ? কিভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল ?

১৫। যিশু খ্রীস্টের জীবন ও বাণী সংক্ষেপে আলোচনা কর। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৬। টীকা লিখ : এট্রাস্কান ; হানিবল ; স্পার্টাকাস ; ক্র্যাসাস ; পম্পি ; মার্ক অ্যান্টনি ; অগাস্টাস সীজার ; রোমান শান্তির যুগ ; সম্রাট কন্স্টান্টাইন ; কন্স্টান্টিনোপল।

১৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :—(ক) ইটালিতে — নদীর — তীরে রোম নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য — উপজাতির লোকেরা ওই নগরী প্রতিষ্ঠা করে। এই নগরী খ্রীষ্ট পূর্ব — অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বলা হয়। বলা হয়, বীর রাজকুমার — এর নাম অনুসারে এই নগরীর নাম হয় রোম।

(খ) রোমানদের দেবরাজ ছিলেন — বা —। যুদ্ধের দেবতা —। বাণিজ্যের দেবতা —। বিদ্যার দেবী —।

(গ) ক্রীতদাস-বিদ্রোহ দমন করেছিলেন সেনাপতি —। ঐ সময় অন্য দুজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন — ও —। এই তিনজনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল —।

(ঘ) সম্রাট — রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন প্রাচীন — নগরে। তাঁর নাম অনুসারে এই নগরের নূতন নাম —।

নবম অধ্যায়

চীন

১

বিশৃঙ্খলার যুগ—কন্‌ফুসিয়াস

বিশৃঙ্খলার যুগ ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে চীনদেশে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। কথিত আছে, গোড়ার দিকে পাঁচজন সম্রাট রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের পরে কয়েকটি রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। ঐগুলি সারা চীনে রাজত্ব করেছিল ব'লে মনে হয় না। বলা হয়, খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ থেকে ১১২৫ অব্দ পর্যন্ত সারা চীনে **শাং-রাজবংশ** রাজত্ব করেছিল। শাং-বংশের শেষ সম্রাট খুবই নিষ্ঠুর ও নির্বোধ ছিলেন। তিনি **চৌ-রাজবংশের** রাজার কাছে পরাজিত হন এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাসাদে আত্মহত্যা করেন। এর পরে চৌ-বংশীয় সম্রাটরা চীনদেশে রাজত্ব করতে থাকেন। এরা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

শাং ও চৌ-বংশীয় সম্রাটরা সারা চীনে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। সম্ভবত তাঁরা সারা চীনদেশের হয়ে দেবতার কাছে পূজা, বলি ইত্যাদি দিতেন এবং সেই অর্থেই চীনদেশের সম্রাট ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে চৌ-বংশীয় রাজাদের প্রাধান্য নষ্ট হয় এবং এ সময় থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত চীনদেশে প্রায় ছ' হাজার ছোট-বড় রাজ্যের উদ্ভব হয়। দশ-বারোটি বড় রাজ্য ঐসব রাজ্যগুলির উপর আধিপত্য করতে।

থাকে। এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ লেগেই থাকত। ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না।

কন্‌ফুসিয়াস : দেশে কিভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায়, তাই ছিল দেশের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির একমাত্র চিন্তা। এইসব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন **কন্‌ফুসিয়াস**।

এখনকার শান্‌তুং প্রদেশের লু রাজ্যে এক অভিজাত পরিবারে কন্‌ফুসিয়াসের জন্ম হয়। তিনি তরুণ বয়স থেকেই লু-রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী বিভাগে কাজ করেন এবং শেষে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। অনেক চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, মানুষ কতকগুলি সৎ রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চললে, আদর্শ মানুষে পরিণত হ'তে পারে এবং এইভাবে দেশে আদর্শ প্রজা, আদর্শ রাজা ও আদর্শ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হবে। কঠোর অনুশাসন ও রীতি-নীতির অনুসরণ দ্বারাই মানুষের আদর্শ চরিত্র গঠন সম্ভব ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন।



কন্‌ফুসিয়াস

এই সময়ে লু-রাজের কাছে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের এক রাজা কয়েকজন সুন্দরী নর্তকী উপহার পাঠান। রাজা ঐসব নর্তকী নিয়ে কয়েকদিন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকেন এবং রাজকার্যে অবহেলা করেন। তাতে কন্‌ফুসিয়াস বিরক্ত হয়ে প্রধান বিচারপতির পদ ত্যাগ করেন এবং তাঁর আদর্শকে কার্যকর করতে পারেন, এমন একজন রাজার সন্ধানে সারা চীনদেশ পর্যটন করেন।

কিন্তু তিনি ঐরূপ কোন রাজার সন্ধান পান না। শেষে তিনি লু-রাজ্যে ফিরে আসেন এবং আদর্শ চরিত্রের মানুষ গঠনের কাজে

মন দেন। এজন্য তিনি একটি শিক্ষালয় খোলেন। এই শিক্ষালয়ে বহু ব্যক্তি এসে শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁর আদর্শ রীতি-নীতিগুলি অনুসরণ করার ব্রত গ্রহণ করেন। কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শ সারা চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ধর্মের মর্যাদা পায়।

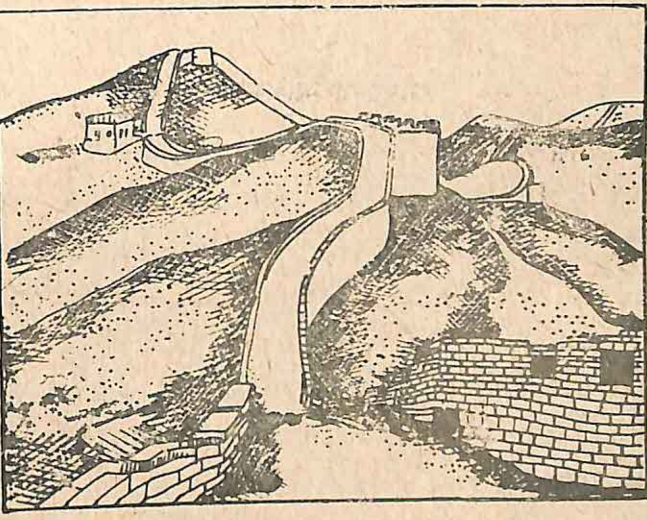
২

চি'ন্ সাম্রাজ্য—চীনের প্রাচীর

শি হুয়াংতি ঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম চীনে চি'ন্ রাজবংশ খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই বংশের এক পরাক্রান্ত রাজা সারা চীনে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং **শি হুয়াংতি** নাম গ্রহণ করেন। **শি হুয়াংতি** শব্দের অর্থ **প্রথম সম্রাট**। তাঁর এই নাম নিরর্থক ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে চীনের প্রথম সম্রাট। তিনি সমগ্র চীনদেশকে পদানত ক'রে ছত্রিশটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং সেগুলির জন্য দক্ষ শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি সারাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন। তিনি সারাদেশে পথ-ঘাট নির্মাণ করেন, সেচ, বন্যানিরোধ প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা করেন।

চীনের প্রাচীর ঃ ঐ সময়ে উত্তর দিক থেকে প্রায়ই তাতার ও হুণজাতীয় লোকরা চীনদেশে হানা দিত। তারা চীনাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করত, চীনে নানরূপ ধ্বংস-কার্য চালাত। এর প্রতিকারের স্থায়ী ব্যবস্থারূপে চীনের উত্তর সীমান্তে শি হুয়াংতি পূর্বে সমুদ্র থেকে পশ্চিমে গোবি মরুভূমি পর্যন্ত এক বিশাল প্রাচীর তৈরী করান। এই প্রাচীর প্রায় বাইশ শ' মাইল দীর্ঘ এবং ১৫ থেকে ২০ ফুট উচ্চ। এটি এতোই প্রশস্ত যে, এর ওপর প্রহরারত সৈনিকদের থাকার জন্য অল্প ব্যবধানে ছোট বড় প্রায় তিন হাজার গৃহ নির্মিত হয়েছিল। এই প্রাচীর এখন স্থানে স্থানে ভগ্ন হ'লেও আজও ইহা পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় হয়ে আছে।

চি'ন্ সাম্রাজ্যের পতন : এই প্রাচীর নির্মাণে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল অর্থ ও অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়েছিল। সম্ভবত বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারাই এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে, দেশে কিছু অসন্তোষ দেখা দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাই কিছু



চীনের প্রাচীর

সংখ্যক বুদ্ধিজীবি শি হুয়াংতির সমালোচনা ক'রে পুস্তক রচনা করেছিলেন। শি হুয়াংতি এতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এজন্য প্রায় চারশ' জন পণ্ডিতকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং দর্শন ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলি নিষিদ্ধ ক'রে পুড়িয়ে দেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০২ অব্দের কাছাকাছি সময়ে শি হুয়াংতির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর চার বছরের মধ্যেই চি'ন্ বংশের পতন ঘটে।

প্রশ্নাবলী

১। চীনের ইতিহাসে বিশৃঙ্খলার যুগ বলতে কি বোঝ? ঐ সময়ে কোন্ শ্রেষ্ঠ চীনা মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

২। কন্‌ফুসিয়াস কে ছিলেন? তাঁর আদর্শ কি ছিল? কিভাবে তাঁর আদর্শ চীনদেশে প্রচারিত হয়েছিল?

৩। কন্‌ফুসিয়াস সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। শি হুয়াংতি শব্দের অর্থ কি? শি হুয়াংতি নাম গ্রহণ কে করেছিলেন? তাঁর এই নাম গ্রহণ কেন সার্থক হয়েছিল?

৫। চীনের প্রাচীর কে নির্মাণ করেছিলেন? কেন নির্মাণ করেছিলেন? চীনের প্রাচীর পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় কেন?

দশম অধ্যায়

ভারত

১

আর্যদের আগমন

ভারতীয় আর্য ঃ ভারত-ই আর্যদের আদি বাসস্থান ব'লে আগে মনে করা হ'ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইরানী, মিডি, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি জাতির মতোই এরা মধ্য-এশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের কোনও অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিল। এরা দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও উন্নত-নাসা। এরা পশুপালক ও যাযাবর ছিল। আবহাওয়ার পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কারণে এরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের একটি শাখা পারস্য ও আফগানিস্থানের পথে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

ভারতে বসতি স্থাপন ঃ আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে কাবুল নদী এবং সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়। তাই এরা যে আফগানিস্থানের পথে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল, তাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবত যারা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা গ'ড়েছিল, তাদের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং তাদের এরা পদানত করেছিল। তারপর এরা ক্রমে পূর্বে এবং পরে দক্ষিণেও বসতি বিস্তার করেছিল। এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এরা ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল বলে মনে হয়।

২

বেদ

'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আর্যরা যখন উত্তর ভারতে বসতি বিস্তার করেছিলেন, তখন আর্য ঋষিরা বেদ রচনা করেছিলেন। বেদে দেবতার স্তবস্তুতি, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ এবং সৃষ্টি,

সত্য, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা আছে। বেদ চার খণ্ডে বিভক্ত—**ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব**।

প্রত্যেক বেদ আবার চার অংশে বিভক্ত—**সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্**। সংহিতায় দেবতাদের স্তবস্তুতি ও মন্ত্রাদি আছে। এগুলিকে বলা হয় **সূক্ত**। ঋগ্বেদ-সংহিতাই সর্বপ্রাচীন। অন্যান্য বেদের বেশির ভাগ সূক্তই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। সামবেদ সংহিতার সূক্তগুলি যজ্ঞাদির সময়ে গাওয়া হ'ত। যজুর্বেদ-সংহিতায় সুললিত গদ্যও আছে। অথর্ববেদ-সংহিতায় আছে স্তবস্তুতি ছাড়াও মন্ত্রতন্ত্র ও ডাকিনীবিদ্যা।

ব্রাহ্মণগুলিতে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ আছে। ব্রাহ্মণের শেষে আছে আরণ্যক। আরণ্যকের শেষে আছে উপনিষদ বা বেদান্ত। এগুলিতে নানা দার্শনিক তত্ত্ব আছে।

৩

প্রথম দিকের আর্যদের সমাজ, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা

সমাজ ঃ আর্যরা পশুপালক ছিল। কিন্তু ভারতের উর্বর-ভূমিতে তারা কৃষিকার্যও শুরু করে। আর্যরা শ্রমশিল্পকে ঘৃণার চক্ষেই দেখত। যে-সব অনার্য জাতি আর্যদের পদানত হয়ে আর্য-সমাজে স্থান পেয়েছিল, তারাই শ্রমশিল্পে নিযুক্ত থাকত। Stem 'A'

আর্য সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা। তবে মাতাকেও সম্মান করা হ'ত। সমাজে নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা ছিল যথেষ্ট। তাঁরা ইচ্ছা ক'রলে লেখাপড়া শিখতে ও চিরকুমারী থাকতে পারতেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষী আর্য রমণীরা তার প্রমাণ।

আর্য সমাজ চারটি বর্ণে ও শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—**ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র**। যাঁরা দেবতার উপাসনা ও বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকতেন, তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। যাঁরা দেশ-শাসন, দেশ-রক্ষা ও যুদ্ধে নিযুক্ত থাকতেন, তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। যাঁরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকতেন, তাঁরা ছিলেন বৈশ্য। আর যেসব অনার্য

আর্যদের পদানত হয়ে আর্য সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান পেয়েছিল, তারা ছিল শূদ্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন উচ্চবর্ণের আর্যদের জীবনকে আবার চার ভাগে বা আশ্রমে ভাগ করা হয়েছিল—**ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস**। আর্যরা বাল্যে গুরুগৃহে কঠোর সংযমের মধ্যে থেকে শিক্ষালাভ করতেন। এই অবস্থার নাম **ব্রহ্মচর্য**। শিক্ষান্তে তাঁরা গৃহস্থের জীবন যাপন করতেন। এই অবস্থার নাম **গার্হস্থ্য**। প্রৌঢ় বয়সে তাঁরা সংসার ছেড়ে বনে প্রস্থান করতেন। এই অবস্থার নাম **বানপ্রস্থ**। শেষে তাঁরা সন্ন্যাসী হ'তেন। এই অবস্থার নাম **সন্ন্যাস**।

বর্ণ ও আশ্রম প্রাচীন আর্যসমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্ণাশ্রমকে ধর্মের অঙ্গ মনে করা হ'ত।

ধর্ম : অন্যান্য আর্য উপজাতির মতোই ভারতীয় আর্যরাও গোড়ার দিকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপাসনা করতেন। তাঁদের প্রধান দেবতা ছিলেন দ্যৌ (আকাশ), মিত্র (সূর্য), ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মরুৎ, পৃথিবী, রুদ্র প্রভৃতি। দেবতাদের যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতি ও বলিদান প্রভৃতির দ্বারা তুষ্ট করা হ'ত। পরে উপনিষদের যুগে তাঁরা এক ও নিরাকার ব্রহ্মের কথাও চিন্তা করেন।

রাজনৈতিক অবস্থা : আর্যরা ভারতে স্থায়ীভাবে বাস ক'রে নগর, জনপদ ও রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এইসব জনপদ ও রাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল গ্রাম। গ্রাম শাসন করতেন **গ্রামণী**। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে হ'ত **বিশ্** বা **জন**। বিশ্ বা জনের শাসককে বলা হ'ত **বিশ্পতি** বা **রাজন্**। দেশে রাজার শাসন বা রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। তবে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য **সভা** ও **মন্ত্রীরা** থাকতেন। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হ'ত **পুরোহিত**। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ত। রাজারা শক্তিশালী হয়ে রাজ্য-বিস্তার করতেন এবং **একরাট, সম্রাট** প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। তাঁদের সার্বভৌমত্ব ঘোষণার জন্য তাঁরা রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করতেন।

কোথাও কোথাও আবার প্রজাতন্ত্রও প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্রে **গণজ্যেষ্ঠগণ** শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন।

৪

মহাকাব্য

ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আর্যদের অনার্য জাতিগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এইসব অনার্য জাতি আর্যদের চক্ষে কদাচারী হ'লেও শৌর্যে, বীর্যে ও ধনসম্পদে আর্যদের তুলনায় কম ছিল না। অন্যদিকে, আর্যরা যতোই বসতি বিস্তার করছিল, ততোই বিভিন্ন আর্য উপজাতির মধ্যে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন নিয়েও যুদ্ধ চলছিল।

এইসব যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে অসংখ্য গল্প-কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছিল। কোনও প্রতাপশালী রাজা যাগযজ্ঞ করলে কবিরা ঐসব গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর কথা গেয়ে শোনাতেন। এই-ভাবে মহাকাব্যগুলির সূচনা হয়েছিল। পরে তা বহু কবির রচনায় ক্রমেই পল্লবিত হয়ে ওঠে এবং বিরাট আকার ধারণা করে ও মহা-কাব্যের রূপ পায়। অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে **রামায়ণে**। আর্য রাজবংশগুলির মধ্যে একটির সার্বভৌম প্রভুত্ব স্থাপনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে **মহাভারতে**। রামায়ণকে মহাকবি **বাল্মীকির** এবং মহাভারতকে **বেদব্যাসের** রচনা বলা হয়।

অনার্যদের সংস্পর্শে আসায় আর্য সমাজে যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তা মহাকাব্যগুলিতে পরিস্ফুট। মহাকাব্যের যুগে অনার্য দেবতা শিব মহেশ্বররূপে অন্যতম প্রধান দেবতার আসন পেয়েছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছিলেন প্রধান দেবতা। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মরুৎ (পবন) প্রভৃতি দেবতারা দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন।

এখন বর্ণভেদের কঠোরতাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। পরশুরাম, দ্রোণ, কৃপা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা যুদ্ধবিদ্যায় ধুরন্ধর হয়েছেন। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় হয়েও দেবতার মর্যাদা পেয়েছেন। রাজা শান্তনু ধীবর-কন্যাকে বিবাহ করেছেন।

মহাকাব্যের যুগে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, সত্যপালন প্রভৃতি আদর্শকে অত্যন্ত উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছিল। বিবাহের জন্য স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রজানুরঞ্জন ছিল রাজার প্রধানতম কর্তব্য।

৫
জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম

আর্য সমাজে যাগযজ্ঞাদি, ক্রিয়াকাণ্ড ও বলিদান খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। উচ্চ বর্ণের মানুষরা নিম্ন বর্ণের মানুষদের ঘৃণার চক্ষে দেখছিলেন। কিন্তু, এইসব অনুষ্ঠান, আড়ম্বর, জীবহিংসা, মানুষের প্রতি ঘৃণা যে কখনও প্রকৃত ধর্ম হ'তে পারে না, এ বিশ্বাস ক্রমেই মানুষের মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর্য ঋষিরা কর্মফল ও পুনর্জন্মের কথাও বলেছিলেন। ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অনেকের মনেই সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরোধী নানা ধর্মমত দেখা দিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে **বৌদ্ধধর্ম** ও **জৈনধর্ম** প্রধান।

জৈনধর্ম : জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন **মহাবীর**। মহাবীরের প্রকৃত নাম **বর্ধমান**। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈশালীর নিকটে জন্মগ্রহণ করেন।



মহাবীর

তাঁর পিতা **সিদ্ধার্থ** 'জ্ঞাতৃক' নামে এক ক্ষত্রিয়কুলের নায়ক ছিলেন। তাঁর **মা ত্রিশলা** ছিলেন লিচ্ছবি রাজকন্যা।

মহাবীরের সঙ্গে **যশোদা** নামে এক মহিলার বিবাহ হয়। কিন্তু সংসারে তাঁর বৈরাগ্য জন্মে এবং তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হ'ন। তিনি নানা স্থানে বারো বৎসর পর্যটন ও তপস্যা করেন। শেষে সুকঠোর সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করেন। ইন্দ্রিয় জয় করায় তাঁর নাম হয় **জিন** বা **জয়ী**। একাজ অত্যন্ত দুষ্কর হওয়ায়, তিনি **মহাবীর** নামেও পরিচিত হন। জিন শব্দ থেকেই **জৈন** শব্দের উৎপত্তি।

ব্রহ্মচর্য, সত্যভাষণ, অচৌর্য (চুরি না করা) ও ত্যাগ জৈনধর্মের মূলকথা। বসন-ভূষণকেও মহাবীর বন্ধন মনে করেন। তাই উলঙ্গ থাকাও জৈনধর্মের অন্যতম আদর্শ। মহাবীর বললেন, ঈশ্বর নেই; মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশিত রূপই ঈশ্বর; প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা আছে। জীবহিংসা মহাপাপ।

মহাবীর ত্রিশ বৎসর মগধ, মিথিলা, অঙ্গ প্রভৃতি নানা রাজ্যে ধর্মপ্রচার করেন। ৭২ বৎসর বয়সে রাজগীরের নিকটে পাবা নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়।

জৈনধর্ম যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। তবে তা ভারতের বাইরে কখনও বিস্তার লাভ করে নি। পরে জৈনরা **দিগম্বর** (উলঙ্গ) ও **শ্বেতাম্বর** (শ্বেতবস্ত্রধারী) নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। দেশে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়। গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এখনও বহু জৈন ধর্মাবলম্বী আছেন।

বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেন **বুদ্ধদেব**। বুদ্ধদেবের প্রকৃত নাম **সিদ্ধার্থ**। বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। কপিলাবস্তুতে শাক্য নামে এক ক্ষত্রিয়-কুলের নায়ক ছিলেন **শুদ্ধোধন**। লুম্বিনী নামক স্থানে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। সিদ্ধার্থের জন্মের কয়েকদিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হ'লে শিশু সিদ্ধার্থ তাঁর মাসী ও বিমাতা **মহাপ্রজাপতি গৌতমীর** নিকট পালিত হ'ন। সিদ্ধার্থের বাল্যকাল ভোগসুখে ও বিদ্যাচর্চায় কাটে। তিনি বহু বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। যৌবনে **গোপা বা যশোধরা** নাম্নী এক আত্মীয়-কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সিদ্ধার্থ আবাল্য ভোগসুখে লালিত হ'লেও ক্রমেই সংসারে তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। মানুষের **জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু** তাকে ব্যাকুল করে। শেষে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন। এই সময়ে তাঁর এক পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম **রাহুল**। সংসারের মায়া ক্রমেই বাড়ছে দেখে তিনি

আর বিলম্ব না ক'রে উনত্রিশ বছর বয়সে একদিন রাত্রিতে গোপনে গৃহত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসী হ'ন।

তারপর তিনি নানা স্থানে পর্যটন করেন ও তপস্যা করেন। অবশেষে ৩৫ বছর বয়সে তিনি গয়ার নিকটে **নৈরঞ্জনা** নদীর তীরে এক বটবৃক্ষমূলে তপস্যাকালে **বোধি** বা পরমজ্ঞান লাভ করেন। বোধি লাভ করায় তাঁর নাম হয় **বুদ্ধ**। তিনি যেখানে তপস্যা করেছিলেন, সেই স্থানের নাম হয় **বোধ গয়া** বা বুদ্ধ গয়া। তিনি যে বৃক্ষতলে তপস্যা করেছিলেন, তার নাম হয় **বোধিবৃক্ষ** বা **বোধিদ্রুম**।


বুদ্ধদেব

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হ'ল—মানুষ বারবার জন্মলাভ করে এবং দুঃখ পায়। দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে জন্মের হাত থেকেও রক্ষা পেতে হবে। মানুষ সৎকর্মের দ্বারা পরজন্মে উর্ধ্বগতি লাভ করে। এইরূপ ক্রমাগত উর্ধ্বগতির ফলে শেষে তার জন্ম হয় না। জন্মের হাত থেকে এই নিষ্কৃতির নাম নির্বাণ। সৎজীবন যাপনের দ্বারাই এইরূপ ক্রমাগত উর্ধ্বগতি এবং অবশেষে নির্বাণ লাভ সম্ভব। এজন্য বুদ্ধদেব আটটি **মার্গ** বা পথের নির্দেশ দেন। তিনি হিন্দুধর্মের যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতির নিন্দা করেন। তিনি জৈনদের সুকঠোর কৃচ্ছসাধনেরও নিন্দা করেন। তিনি বর্ণভেদ ও জীবহিংসারও নিন্দা করেন।

তিনি ৪৫ বছর ধরে মগধ, কোশল, কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে **কুশীনগরে** আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

অশোক, কণিষ্ক প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ রাজা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

করায় বৌদ্ধধর্ম কেবল সারা ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধরা পরে **মহাযান** ও **হীনযান** নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। বৌদ্ধধর্ম সারা এশিয়ায় বিস্তার লাভ করলেও পরে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে ভারতে প্রায় লোপ পায়। Item - I 'A

৬

মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য

মগধের অভ্যুত্থান : বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতে ষোলটি প্রধান রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে বর্তমান দক্ষিণ বিহারের **মগধ** রাজ্যটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের সময়ে মগধের রাজা ছিলেন **বিম্বিসার**। তাঁর পুত্র **অজাতশত্রুর** সময়ে মগধের অধিকার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কাশী, কোশল ও বৃজি রাজ্যগুলি মগধের অধিকারে আসে। অজাতশত্রুর পুত্র বা পৌত্র **উদয়ীভদ্র পাটলিপুত্রে** মগধের রাজধানী স্থাপন করেন।

অজাতশত্রুর পরবর্তী বংশধরদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁদের পর **শিশুনাগ-বংশীয়** রাজারা কিছুদিন মগধে রাজত্ব করেন। শিশুনাগ-বংশের রাজা **কাকবর্ণীকে** হত্যা করে **মহাপদ্ম নন্দ** মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে জানা যায়, তিনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। তিনি যে ঐ সময়ে ভারতের সর্বাধিক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমে তাঁর রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্য : মহাপদ্ম নন্দের পুত্র রাজা **ধন নন্দের** সময়ে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধেই সাহায্য চেয়ে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। গুপ্তচর সন্দেহে আলেকজাণ্ডার তাঁকে বন্দী করেন। চন্দ্রগুপ্ত কোনক্রমে পলায়ন করেন এবং **চাণক্য** নামে তক্ষশিলার এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের সহায়তায় নন্দরাজ ধন নন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে মগধে **মৌর্য বংশের** প্রতিষ্ঠা হয়।

মৌর্য নাম সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্রগুপ্তের মা মুরা নন্দরাজার দাসী-পত্নী ছিলেন। মুরা শব্দ থেকেই মৌর্য নামের উৎপত্তি। অনেকের মতে, চন্দ্রগুপ্ত **মোরীয়** নামে এক ক্ষত্রিয়কুলের রাজকুমার ছিলেন। মোরীয় শব্দ থেকেই মৌর্য নামের উৎপত্তি। দ্বিতীয় মতটিই অভ্রান্ত মনে হয়।

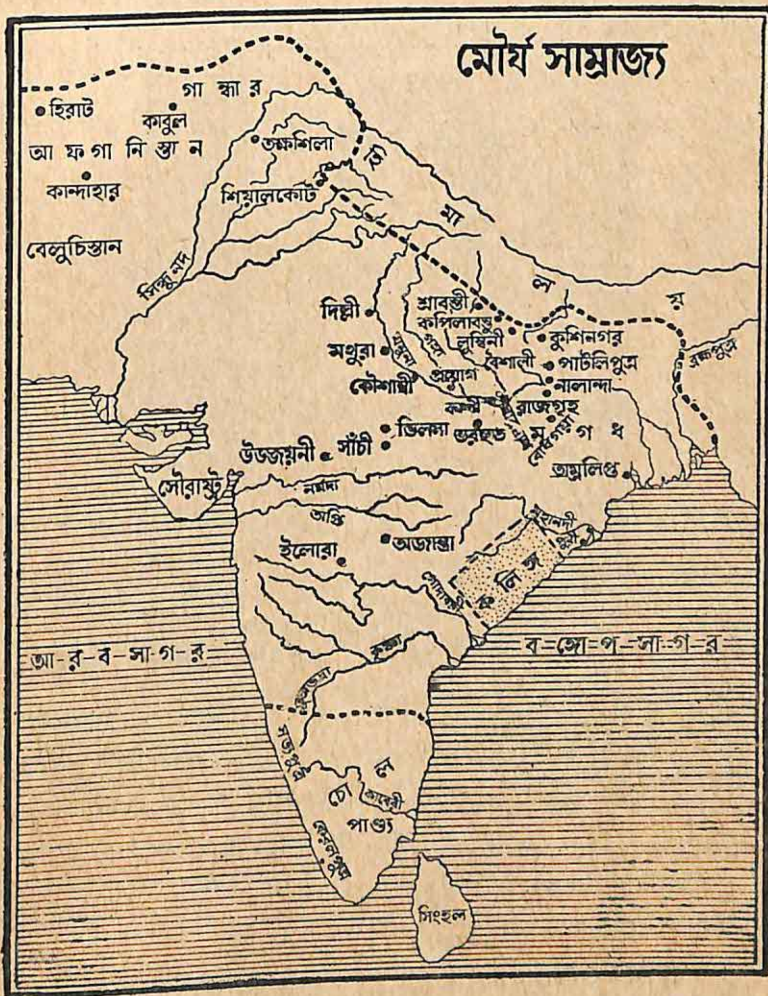
নন্দ-সাম্রাজ্য অধিকার করায় মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য পাঞ্জাবের গ্রীক-বিজিত অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক-শাসিত ভারতীয় অঞ্চল জয় করলে গ্রীক-বিজিত এশিয়ার অধীশ্বর **সেলুকাসের** সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে কে বিজয়ী হয়েছিলেন, ঠিক বলা যায় না। তবে সন্ধির শর্ত দেখে মনে হয়, চন্দ্রগুপ্তই জয়ী হয়েছিলেন। কারণ, সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে হীরাট, বালুচিস্থান ও আফগানিস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। অন্যপক্ষ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হাতি দিয়েছিলেন। সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে কোন বিবাহগত সম্পর্কও হয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং জৈন প্রথা অনুসারে মহীশূরের **শ্রবণ বেলগোলা** নামক স্থানে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন (আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ অব্দ)।

অশোকঃ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্রাট হন তাঁর পুত্র **বিন্দুসার**। বিন্দুসারের মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র অশোক ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা **সুসীমকে** হত্যা করে সম্রাট হন। ঐসময়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গোদাবরী ও মহানদী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কলিঙ্গ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। অশোক ঐ রাজ্য আক্রমণ করলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিহত ও দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়। যুদ্ধের পর দুর্ভিক্ষে এবং মহামারীতেও বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধে অশোক বিজয়ী হ'লেও অসংখ্য মানুষের এই মৃত্যু ও দুঃখদুর্দশা তাঁকে বিচলিত করে। তিনি শান্তিলাভের জন্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন।

এখন তিনি যুদ্ধ ও দেশজয়ের নীতি ত্যাগ ক'রে শান্তি ও অহিংসার

নীতি গ্রহণ করেন এবং মানুষের ও জীবের কল্যাণ সাধনই তাঁর একমাত্র ব্রত হয়ে ওঠে। তিনি রাজ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র কূপ খনন, পথঘাট নির্মাণ, পান্থশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপন, পথিপার্শ্বে ফলকর ও ছায়াদায়ক বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি অসংখ্য



জনহিতকর কাজ করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বুদ্ধের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি বুদ্ধের বাণী ও নানা সুনীতিপূর্ণ উপদেশ পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত করেন। ঐসব বহু স্তম্ভ ও লিপি আজও বর্তমান আছে। এগুলি **ধর্মলিপি** নামে পরিচিত।

অশোকের সময়েই মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও অশোক শান্তি ও মানব-কল্যাণের নীতি



অশোক

গ্রহণ করেন। পার্শ্ববতী দেশসমূহের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলেন। তাই অনেকে তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট আখ্যা দিয়েছেন।

অশোক প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। খ্রীষ্ট পূর্ব ২৩২ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুষাণগণ ও কণিষ্ক ঃ অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর শান্তির নীতি ও যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। দেশে ছোট বড় অনেক রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে **বাহ্লীক-গ্রীক, শক, কুষাণ** প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলি ভারতে প্রবেশ করে। এরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। অনেকে

ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতেও আধিপত্য বিস্তার করে। এরা ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে নিজের ব'লে গ্রহণ করেছিল এবং কালক্রমে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

মধ্য-এশিয়া থেকে শক ও তাদের পেছনে **ইউয়ে-চি** জাতির লোকরা ভারতে এসেছিল। ইউয়ে-চি জাতির মধ্যে **কুষাণরাই** ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। কুষাণরা উত্তর-পশ্চিমে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **কণিষ্ক**। কণিষ্ক সম্ভবত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল **পুরুষপুর** (পেশোয়ার)। উত্তর ভারতের সুবিশাল অংশে এবং ভারতের বাইরে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও উত্তরে সিরদরিয়া নদী পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে কেটেছিল। তবু তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। সম্ভবত তাঁর সময়েই বৌদ্ধধর্ম চীনে বিস্তারলাভ করে। তিনি বহু মঠ ও স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে **মহাযান** বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলিত হওয়ায় ঐ সময় ভাস্কর্যশিল্পের অত্যন্ত উন্নতি হয়। গ্রীক ও ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্পের মিলনে **গান্ধার-শিল্প** নামে পরিচিত মূর্তি-নির্মাণ শিল্প এই সময়েই চরম বিকাশ লাভ করে। তিনি সাহিত্যের উৎসাহী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সভায় বিখ্যাত কবি-নাট্যকার **অশ্বঘোষ** উপস্থিত ছিলেন।



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কণিষ্কের মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। এরপর প্রায় দু'শ বছর ভারতে আর কোনও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়নি।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গুপ্ত-বংশীয়

চন্দ্রগুপ্ত মগধে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। সম্ভবত বর্তমান বিহার, উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-প্রদেশের কিছু অংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল **পাটলিপুত্র**।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত** উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্য জয় ক'রে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি উত্তর ভারতের বিজিত রাজ্যগুলি নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে বশ্যতা স্বীকার করান। দিগ্‌বিজয় শেষে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এইভাবে ভারতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্‌বিজয়ী বীরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে ভাগীরথী থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাবের শতদ্রু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।



বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** রাজা হন। তিনি **বিক্রমাদিত্য** উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের মতে, তিনি ও কাহিনী-কিংবদন্তীতে বর্ণিত বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি। তিনি শকদের পরাজিত ক'রে মালব অধিকার করেন এবং শকারি (শকদের শত্রু) উপাধি গ্রহণ করেন এবং মালবের **উজ্জয়িনীতে** দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

মহাকবি **কালিদাস** তাঁর সভাকবি ছিলেন। তাঁর সময়েই চীনা পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারত-ভ্রমণে আসেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **কুমারগুপ্ত** ও পৌত্র **স্কন্দগুপ্ত** রাজা হন। স্কন্দগুপ্তের সময়েই মধ্য-ভারত থেকে আগত **হূণ** জাতির লোকরা ভারত আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত হূণ আক্রমণ ব্যর্থ করেন।

স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব, অধীন

রাজাদের বিদ্রোহ এবং হূণ আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। গুপ্তবংশীয় রাজারা আরও কিছুদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাজ্যে রাজত্ব করতে থাকেন।

৭

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বাংলাদেশ

সুপ্রাচীনকালে বাংলাদেশে যে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, এমন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনেক পাওয়া গেছে। কিন্তু এখানকার ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও নিতান্ত অস্পষ্ট। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র এবং গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে সাঁওতাল-কোল-ভীলজাতীয় লোক, দ্রাবিড় ও তিব্বত-বর্মী-জাতীয় লোক বাস করত। আর্যরা এদের অসভ্য ও অশুচি মনে ক'রে ঘৃণা করত। আর্য সভ্যতা বিস্তারের পরে এখানে আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতিরই প্রাধান্য ঘটে এবং বাংলাদেশও আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মহাভারতের কাহিনী থেকে জানা যায়, উত্তরবঙ্গে **পৌণ্ড্র** নামে এক অনার্য রাজা খুবই শক্তিশালী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরাজিত ক'রে বধ করেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকালে যজ্ঞের অশ্ব রক্ষার জন্য ভীমকে তাম্রলিপ্ত ও বঙ্গের রাজাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

সিংহলে প্রাপ্ত বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সসৈন্যে সমুদ্রযাত্রা ক'রে লঙ্কা জয় করেছিলেন এবং তাঁর নাম থেকেই লঙ্কার নাম 'সিংহল' হয়েছিল।

জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বহু জৈন তীর্থংকর বাস করতেন। জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথ এখানেই দেহত্যাগ করেন। যে পর্বতে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল, তা এখন পার্শ্বনাথ বা **পরেশনাথ** পাহাড় নামে পরিচিত। মহাবীরও এখানে বহুদিন ছিলেন। জৈন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এখানকার অধিবাসীরা রুক্ষ প্রকৃতির ছিল। তারা একবার মহাবীরকে প্রহার করেছিল। তারা প্রায়ই জৈন সন্ন্যাসীদের ওপর কুকুর লেলিয়ে দিত এবং সেজন্য জৈন সন্ন্যাসীদের লাঠি ব্যবহার করতে হ'ত।

গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন এখানে **গঙ্গরিডই** নামে এক জাতির লোক বাস করত। তারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিল। গঙ্গরিডই জাতির রাজার চার হাজার রণহস্তী ও বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। সেজন্য অন্য কোন রাজা তাদের রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস পেত না।

মৌর্য যুগে বাংলাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরও গঙ্গরিডই জাতি এখানে প্রবল ছিল। একথা গ্রীক লেখক **টোলেমির** রচনা এবং অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক-রচিত **পেরিপ্লাস** গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তার কোন-কোনটিতে গুপ্তবংশীয়রাও রাজত্ব করতে থাকেন।

৮
বৈদেশিক যোগাযোগ

সিন্ধু সভ্যতার যুগেও যে বাইরের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ব্যবসায়ের সম্পর্ক ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। পারসিক ও গ্রীকরা উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করলে এই যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে ও রাজসভাতে অনেক পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করছেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের সময়ে গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাহ্লীক গ্রীকরা ভারতে রাজ্য স্থাপন করায় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির মিলন আরও নিবিড় হয়েছিল। এইসব গ্রীকরা অনেকেই ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গুপ্ত যুগে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। রোমান স্বর্ণমুদ্রা দিনারের নাম অনুসারে ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রারও নাম হয়েছিল 'দিনার'। ভারতের অনেক স্থানে অসংখ্য রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে।

শক, পহ্লব, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলি ভারতে আসায় এবং কিছু অংশে অধিকার বিস্তার করায় বাইরের সঙ্গে ভারতের

যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসব জাতির লোকরা ভারতের জনসমুদ্রে একদা বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং এদের নিজ নিজ সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি ভারতীয় প্রথা ও রীতিনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এরা সকলেই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল এবং এর বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল। কুষাণরাজ কণিষ্ক উত্তরে মধ্য-এশিয়া ও চীনের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন এবং বহু বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। এইভাবে পারস্য ও আফগানিস্থান থেকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয়রা ঐসব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, রাজ্য-জনপদ গড়ে তুলেছিল, ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়েছিল। খোটান, কাশগর, কারাশর, ইয়ারকন্দ, তুরফান প্রভৃতি স্থান একসময় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র ছিল। মধ্য-এশিয়ার বহু স্থানে খননকার্যের ফলে ভারতীয় সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন এবং ভারতীয় ভাষা ও লিপিতে লেখা বহু পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। চীনের সীমান্তে তুন্ হোয়াং গিরিগুহায় যেসব বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ বিহারের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তা-ও ঐসব অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের জ্বলন্ত প্রমাণ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও প্রাচীনকালেই ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল। এই যোগাযোগ প্রধানত সমুদ্রপথেই ঘটেছিল। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস, সিয়াম ও ইন্দোনেশিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চলে ভারতীয়রা ব্যবসায়-বাণিজ্য করত, উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, রাজ্য স্থাপন করেছিল। কাম্বোডিয়ার (সেকালের হিন্দু-রাজ্য কম্বোজ) অপূর্ব বিষ্ণুমন্দির এবং যবদ্বীপের বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ বরবুদুর আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

৯

বৈদেশিক বিবরণ—মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন

মেগাস্থিনিস : মেগাস্থিনিস ছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক

রাজা সেলুকাসের দূত। তিনি তাঁর লেখা **ইণ্ডিকা** নামে পুস্তকে মৌর্য যুগের ভারত-সম্পর্কে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন।

তিনি লিখেছেন, ঐসময় ভারতবাসীরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—দার্শনিক, কৃষক, শিকারী, পশুপালক, কারিগর ও ব্যবসায়ী, সৈনিক, গুপ্তচর ও অমাত্য। ঐ সময়ে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল না। তাঁর এই উক্তিকে সত্য ব'লে গ্রহণ করা যায় না। ভারতে ক্রীতদাসের সংখ্যা অল্প হওয়ায় এবং ক্রীতদাসের প্রতি সদয় ব্যবহার করায় সম্ভবত ক্রীতদাস-প্রথা তাঁর চোখে পড়েনি।

তিনি ভারতীয়দের উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন, তারা সরল, অনাড়ম্বর ও সত্যবাদী। ভারতীয় কৃষকরা খুবই সংযমী, মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী। ভারতীয়রা অলংকারপ্রিয়। ভারতীয় অভিজাতরা খুবই শৌখিন।

তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, ঐ সময় দেশে অনেক শহর ছিল। সেগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল রাজধানী পাটলিপুত্র। শহরটি ছিল দৈর্ঘ্যে ন'মাইল ও প্রস্থে পৌনে দু'মাইল। শহরের চারদিকে প্রশস্ত গভীর পরিখা ও উচ্চ প্রাচীর ছিল। প্রাচীরে ছিল ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি মিনার। শহরের পরিচালনার ভার ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সমিতির ওপর ছিল।

ফা-হিয়েন : চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতে এসেছিলেন। তিনি প্রায় পনের বছর ভারতে ছিলেন এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে তিন বছর থেকে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে ক'রে সিংহল ও যবদ্বীপের পথে ভারতে ফিরে যান।

তাঁর লেখা বিবরণী থেকে জানা যায়, ভারতবাসীরা ছিল সৎ ও সত্যবাদী। দেশে দণ্ডের কঠোরতা ছিল না। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত না। কেবলমাত্র কেউ রাজদ্রোহ করলে তার ডান হাত কেটে দেওয়া হ'ত। তখন দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না। ভারত-বাসীরা ছিল খুবই দানশীল ও অতিথিপরায়ণ। তারা ছিল

পরধর্মসহিষ্ণু। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করত। পাঞ্জাব, মথুরা ও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। মধ্য ভারতে প্রবল ছিল হিন্দুধর্ম।

১০

প্রাচীন ভারতে সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

সাহিত্য ঃ প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় কবিরা সাহিত্য রচনা শুরু ক'রে ছিলেন। তাঁদের রচিত কাব্য-কাহিনীগুলিই নানাভাবে পল্লবিত ও সমৃদ্ধ হয়ে রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্যের রূপ পেয়েছিল। কুষাণ যুগে কাব্য ও নাটকের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কণিষ্কের সমসাময়িক কবি ও নাট্যকার **অশ্বঘোষ** তাঁর 'বুদ্ধচরিত' প্রভৃতি কাব্য ও নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু **গুপ্ত** যুগে সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল। ঐ যুগে মহাকবি **কালিদাস** তাঁর অতুলনীয় নাটক ও কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। **বিশাখদত্ত, শূদ্রক** প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকারও ঐ যুগেই জন্মেছিলেন। রামায়ণ, মহাকাব্য ও পুরাণকাহিনীগুলি ঐ যুগেই বর্তমান রূপ পেয়েছিল।



অজন্তার প্রাচীরে আঁকা মা ও ছেলে

শিল্পকলা ঃ প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পগুলি অসামান্য বিকাশ লাভ করেছিল। অশোকের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে ফা-হিয়েন বলেছিলেন, এসব সৃষ্টি মানুষের নয়। অশোক-স্তম্ভ ও অশোক-স্তম্ভের শীর্ষের মূর্তিগুলি এবং সাঁচীস্তূপ মৌর্য যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাচীনকালে পাহাড় কেটে যে সকল গুহামন্দির নির্মাণের রীতি চালু হয়েছিল অজন্তার গুহা-মন্দিরগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কুষাণ যুগে ভাস্কর্যের বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল। গ্রীক ও ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের মিলনে **গান্ধার শিল্প** নামে এক অপরূপ মূর্তিনির্মাণ শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। গুপ্তযুগে ভাস্কর্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল।

প্রাচীনকালের অনবদ্য চিত্রকলার দৃষ্টান্ত আজও অজন্তার গুহামন্দিরগুলির প্রাচীর-গাত্রে রক্ষিত আছে। এইসব চিত্র রেখায়, রঙে, গঠন-বৈচিত্র্যে আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিলেন। তার প্রমাণ তাঁদের রচিত **ষড়্দর্শন ও বেদাঙ্গ**। ষড়্দর্শনে আছে গভীর দার্শনিক আলোচনা। বেদাঙ্গে আছে ধ্বনি, ছন্দ, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও চিন্তা। গুপ্তযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছিল। ঐ যুগে **আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের** মতো জ্যোতির্বিদ জন্মেছিলেন। আর্যভট্টই প্রথম পৃথিবীতে বলেছিলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। প্রাচীন ভারতে রসায়নেরও খুবই উন্নতি হয়েছিল। প্রমাণ, তার অপূর্ব ধাতুশিল্প। চিকিৎসাবিদ্যাতেও ভারতীয়রা অগ্রণী ছিলেন। **জীবক, চরক, সুশ্রুত** প্রভৃতি চিকিৎসকগণ প্রাচীন ভারতেই ছিলেন এবং আয়ুর্বেদ নামে চিকিৎসা-শাস্ত্র গ'ড়ে তুলেছিলেন।

ভারতীয়রা সুপ্রাচীন কাল থেকেই লিখতে পড়তে জানতেন। সভ্যতার লিপি, অসংখ্য অশোকলিপি প্রভৃতিই তার প্রমাণ। তাঁরা উচ্চ-শিক্ষাতেও অগ্রণী ছিলেন। প্রাচীন ভারতেই **তক্ষশিলা ও নালন্দার** মত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

প্রশ্নাবলী

১। আর্যরা প্রথমে কোথায় বাস করতেন? তাঁরা চারদিকে কেন ছড়িয়ে পড়েছিলেন? কোন পথে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন? তাঁরা কোথায় প্রথমে বসতি স্থাপন করেছিলেন?